দাম : ষোলো টাকা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

স্বামী প্রণবানন্দের
রাজনৈতিক প্রতিরূপ
ড. শ্যামাপ্রসাদ — পৃঃ ২৩

৭৪ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ৪ জুলাই, ২০২২।। ১৯ আষাঢ় - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

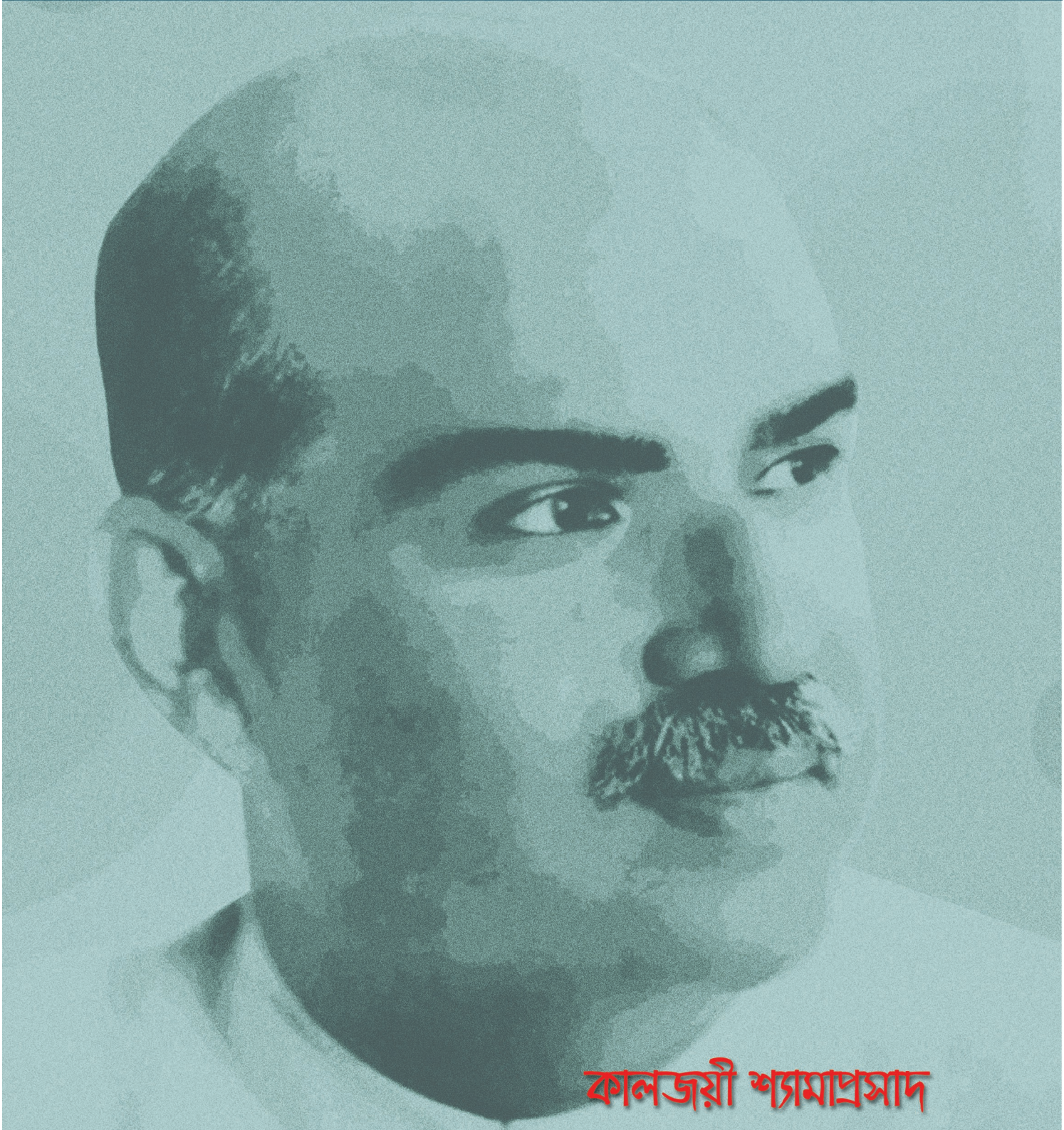

কালজয়ী শ্যামাপ্রসাদ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৭৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১৯ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৪ জুলাই - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

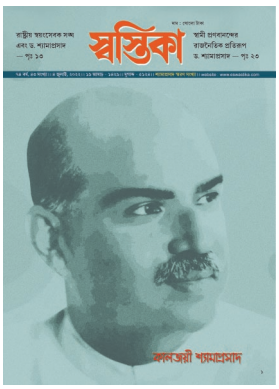

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

উদ্ধবের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিন উদ্ধত মমতা
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ক্ষমা করবেন মা সারদা □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এক যোদ্ধা
□ ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি □ ৮

অগ্নিপথের বিরোধীরা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী নন
□ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১১

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ
□ বিজয় আঢ্য □ ১৩

স্বামী প্রণবানন্দের রাজনৈতিক প্রতিরূপ ড. শ্যামাপ্রসাদ □ কল্যাণ গৌতম □ ২৩

সংসদে নেহরুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের দ্বৈরথ
□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ২৫

নেহরুকে যোগমায়া দেবীর পত্র □ ২৮

বিপত্তারিণী ব্রতে শুভ সংখ্যা তেরো
□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ফজলুল হককে সমালোচনায় বিঁধতে ছাড়েননি শ্যামাপ্রসাদ □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ৩৫

শ্যামাপ্রসাদের বড়ো হয়ে ওঠা এবং পারিবারিক সংস্কার □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সমাবেশ
সমাচার : ২৯-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

প্রকাশিত হবে
১১ জুলাই
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১১ জুলাই
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দ্রৌপদী মুর্মু

আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মু নিজের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। নির্বাচিত হলে তিনি হবেন ভারতের প্রথম জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রপতি। সেই সঙ্গে ওড়িশা থেকে এই প্রথম কেউ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী— কেমন ছিল এই দীর্ঘ পথ? ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে কতটা চড়াই-উতরাই পার করে তিনি আজ এখানে পৌঁছেছেন? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য। লিখবেন অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, এই সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

এবার থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
Sreemani Market, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাগ্রত শ্যামাপ্রসাদ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুর চেতনায় ধীরে ধীরে শ্যামাপ্রসাদ জাগ্রত হইতে শুরু করিয়াছেন। আসলে বাঙ্গালিকে দীর্ঘদিন জানিতেই দেওয়া হয় নাই যে, যে পশ্চিমবঙ্গে তাহারা বসবাস করিতেছেন, তাহা শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্ট। তাহা তাঁহার অক্লান্ত লড়াইয়ের ফল। বাঙ্গালিকে জানিতেই দেওয়া হয় নাই যে, পূর্ব পাকিস্তানে জেহাদি মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীদের দস্যুদের হাতে ফেলিয়া, সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়িয়া যে পশ্চিমবঙ্গে তাহারা অশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরই অক্লান্ত আন্দোলনের ফল। ওপার বাঙ্গলা হইতে পলাইয়া আসা বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টরা সেইদিন 'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' স্লোগান তৈরি করিয়া সেই ছিন্নমূল মানুষদের লইয়া রাজনীতি করিয়া শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালি দিয়াছেন। প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া ছিন্নমূল মানুষদের ভোটে জিতিয়া তিন দশকের বেশি সময় ক্ষমতা ভোগ করিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা বাঙ্গালি জনমানস হইতে শ্যামাপ্রসাদকে অবসৃত রাখিয়াছিল। প্রকৃত অর্থেই কংগ্রেসিরা ভণ্ড দেশপ্রেমিক এবং কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী। ইতিহাস তাহার প্রমাণ। স্বাধীনতার আগে এবং পরেও তাহারা দেশের মানুষের চিন্তা চেতনাকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছেন। একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদ, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা তথা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় প্রাণ বলিদানকারী ভারতমাতার একনিষ্ঠ পূজারি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে তাহারা যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়াছেন। ইংরেজদের চক্রান্ত, মুসলিম লিগের দাবি, কংগ্রেস নেতাদের গদির লোভ এবং কমিউনিস্টদের সমর্থনে যখন দেশবিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া পাকিস্তানের কবল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সৃজনে শ্যামাপ্রসাদের এই মহিমান্বিত ভূমিকাকে বাঙ্গালির মন হইতে অপসৃত করিয়াছিল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা।

বাঙ্গালিকে জানিতে দেওয়া হয় নাই যে, বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমিখণ্ড আদায় করিবার লক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদের লড়াইয়ে সহযোগী হইয়াছিলেন তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। ছিলেন ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ। মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রধান প্রমথরঞ্জন ঠাকুরও সেই সময় শ্যামাপ্রসাদের পাশে দাঁড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ স্বীয় কণ্ঠশোভিত মাল্য শ্যামাপ্রসাদের গলায় পরাইয়া তাঁহাকে হিন্দু নেতা হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন বাঙ্গালি শিরোমণিরা শ্যামাপ্রসাদকে আশীর্বাদ ও সমর্থন করা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের চক্রান্তে শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়া বাঙ্গালি মহাপাপ করিয়াছে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালির অক্ষিপট হইতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মায়াজাল অপসৃত হইয়াছে। বাঙ্গালি প্রায়শ্চিত্যে ব্রতী হইয়াছে। বাঙ্গালির চিন্তাচেতনায় শ্যামাপ্রসাদ জাগ্রত হইতেছেন। বাঙ্গালি আজ অনুভব করিতে পারিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের আর এক নাম শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, তাই বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাঁহাকে শতকোটি প্রণাম।

সুভাষিতম্

কায়েন মনসা বাচা ধনেনাপি জনেন চ।

স্বদেশ রক্ষণার্থায় যতেত মতিমান জনঃ।।

শরীর, মন, বাক্য, ধন ও লোকবলের দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা স্বদেশ রক্ষায় সচেষ্ট হন।

উদ্ধবের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিন উদ্ধত মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ভারতের রাজনৈতিক দলে পারিবারিক বিষের প্রভাব। কংগ্রেস থেকে শুরু। নেহরু-ইন্দিরা- রাজীব-সোনিয়া-রাহুল হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে তার শেষ হবে বলে আমার ধারণা। পুত্র শুভব্রত বসু (চন্দন)-কে ঘিরে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও ফেঁসেছিলেন সেই পারিবারিক জালে।

মহারাষ্ট্রের শিবসেনা দলে উদ্ধব ঠাকরে আর পুত্র আদিত্যর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে ক্ষোভ। অনুপাতে সমান না হলেও বঙ্গে তৃণমূলের মধ্যেও ধিকিধিকি জ্বলছে ক্ষোভের আগুন। টার্গেট পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ভাইপো অভিষেক। আপাতত সে আঁচ ছাই চাপা রয়েছে, কারণ তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আর শিবসেনা পরমুখাপেক্ষী। উদ্ধব মমতা হলে বিদ্রোহ তলিয়ে যেত আরব সাগরের জলে। ক্ষোভের আঁচ মমতা কতদিন চাপবেন সেটাই দেখার। তৃণমূলের কিছু মিনমিনে নেতা অভিষেককে পছন্দ করেন না। মমতা অভিষেককে পক্ষী শাবকের মতো আগলে রাখেন। যদিও বহু অনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত অভিষেক। অভিষেকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দলীয় চাকরি খুইয়েছেন সাংসদ সৌগত রায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় কমিটি থেকে দু'জনেই বাদ পড়েছেন। সাযুজ্য বজায় রাখতে বাদ গিয়েছেন অভিষেকপন্থী সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়ান। একজন সাংসদের কথায় 'মাসের পর মাস মমতা ফোন ধরেন না। সংবাদমাধ্যম কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারি না। অথচ ভুল হয়ে গেলে সেনসর করবে'।

বিগত ছ'মাসে উদ্ধবের সরকারি আলয় 'বর্ষা'তে প্রবেশ পাননি শিবসেনার বিধায়করা। অথচ শরদ পাওয়ারের এনসিপির নেতারা যথেচ্ছ যাতায়াত করেছেন। এই দূরত্বের ফল ভুগতে হচ্ছে উদ্ধবকে। উদ্ধব বিরোধী একনাথ শিন্ডে বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দু'বছর পর মহারাষ্ট্রে ভোট। বিজেপি তাই তাড়াহুড়ো চাইছে না। মমতা তাঁর হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে বৈঠক না ডাকলে তৃণমূলের কোনো নেতা সাহস করে ওমুখো হন না। তাদের গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছেন অভিষেক। সব ধরনের ওজর আপত্তি নস্যাৎ করে দলবদলু বাবুল সুপ্রিয় আর অর্জুন সিংহকে তিনি তৃণমূলে ঢুকিয়েছেন। আপাতত হাত ফসকে নাগালের বাইরে রয়েছেন আর এক সাংসদ। বাবুল আর অর্জুনকে ঘিরে দলে বিস্তর ক্ষোভ।

উত্তর ২৪ পরগনার নেতা পার্থ ভৌমিক অভিষেককে নাকি সাফ জানিয়েছেন অর্জুনকে জেতানো অসম্ভব। বিজেপির সাংসদ থাকার সময় অর্জুন তাদের ঘর-বাড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন। 'ঘর ফেরতা' রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়ের মতো অর্জুন আর বাবুলরা এখন 'না ঘরকা না ঘাটকা'। ১৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর যশবন্ত সিনহাকে রাজ্য মন্ত্রীসভায় উচ্চপদে স্থান দিতে পারেন মমতা। ওই দিন তৃণমূলের শহিদ দিবস। অসুস্থ অমিত মিত্র এখন রাজ্যের অ্যাড-হক অর্থমন্ত্রী। প্রথম বিজেপি জমানায় ভারতের কৃতী অর্থমন্ত্রী ছিলেন যশবন্ত সিনহা। তৃণমূলের 'বৃদ্ধতন্ত্র' ভাঙতে চান অভিষেক। আর তাই নিয়েই ক্ষোভ। ২০ সদস্যের জাতীয় কমিটিতে ৪ জন বাদে সকলেই অভিষেক বিরোধী।

তবে অভিষেকের খাঁড়া পড়লে তাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা হবে। একনাথদের মতো দল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস অভিষেক বিরোধী নেতাদের নেই। এক জাঁদরেল সাংসদের কথায় 'রাজ্যের মানুষ মমতার পাশে রয়েছে। দল ছাড়লে মানুষ আমাদের ভুলে যাবে। সহধর্মিণীর ভোটটাও পাব না। তাই হাত-পা ধরে পড়ে রয়েছি'। বিক্ষোভ সামলাতে দু'বার জাতীয় কমিটি পালটান মমতা। ভাইপোকে বার্তা দেন বৃদ্ধদের বাদ দেওয়া যাবে না। আগামীতে মমতা আর তৃণমূল সমার্থক নাও থাকতে পারে। তাই মমতার উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ বা আক্রমণ চালানো বৃথা। মমতার পারিবারিক প্রীতি বা আঠা যে তার সর্বনাশ ডেকে আনবে তা বলা বাহুল্য। আমার ধারণা, তাঁর দলে 'ইমপ্লোশন বা অন্তর্বিস্ফোরণ হবে'। ইন্দিরার পতনের পর বলা হতো 'তেলে আর ছেলে ইন্দিরাকে খেলে'। মমতাকে তাই ঔদ্ধত্য ছাড়তে হবে। পরিবার ভুলে রাজ্যের রাজধর্ম পালন করতে হবে। নাহলে জয়ললিতা, মায়াবতী বা উদ্ধবের মতো তাঁকেও হারিয়ে যেতে হবে। □

মমতাকে ঔদ্ধত্য ছাড়তে হবে। পরিবার ভুলে রাজ্যের রাজধর্ম পালন করতে হবে। নাহলে জয়ললিতা, মায়াবতী বা উদ্ধবের মতো তাঁকেও হারিয়ে যেতে হবে।

ক্ষমা করবেন মা সারদা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আজ এক সন্ধিক্ষণে আপনাদের এই চিঠি। যাঁকে এতদিন মুখ্যমন্ত্রী বলে দেখে এসেছেন তিনি আসলে মা সারদাই। মা সারদাই মমতা রূপে জন্ম নিয়েছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমন তো বলাই যায়। দিদিকে মায়ের রূপে দেখার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। এর আগে 'বাংলার দিদি'-র মধ্যে মা দুর্গাকে দেখতে পেয়েছেন তৃণমূলের অনেক নেতাই। কিন্তু হিসেব কষে সংখ্যাতত্ত্ব মিলিয়ে দিতে পারেননি কেউ। এবার সেটাই করে দিলেন দিদির ভাই (পড়ুন সন্তান) নির্মল মাজি।

অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন মা সারদা দিদির রূপে ফিরে এসেছেন ধরায়। জয়রামবাটীর মা সারদা আর কালীঘাটের মমতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন একেবারে ঐতিহাসিক ভাবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু আবেগের বশে 'মা সারদা' বলে সম্বোধনই করলেন না, নিজের মন্তব্যের পক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা।

নির্মল মাজি দাবি করেছেন, 'দিদিই মা সারদা।' এ নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, 'মৃত্যুর দিনকয়েক আগে বিবেকানন্দের কয়েকজন সতীর্থ মহারাজকে মা সারদা বলেছিলেন, পরবর্তীতে কালীঘাট মন্দির এলাকায় মনুষ্যরূপে জন্ম নেব। সেই জন্মের পর ত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হব। রাজনৈতিক কাজকর্মও করব।'

এরপরই নির্মল মাজি মমতাকে মা সারদা বলার পক্ষে যুক্তি দিয়ে যোগ করেন, 'সময়, সংখ্যাতত্ত্ব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মা সারদা। কারণ, দুর্গাপুজোর অষ্টমী-নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। দিদি মা সারদা, দিদিই সিস্টার নিবেদিতা, দিদিই ঘরের দুর্গা।'

তবে নির্মলই প্রথম নন। এর আগে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রও মমতার মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। আবার মানস ভুঁইঞা মমতাকে তুলনা করেছিলেন মা দুর্গার সঙ্গে। আর এবার সরাসরি নির্মল মাজি দাবি করলেন, মমতাই মা সারদা।

> যাঁর বিরুদ্ধে আদ্যপ্রান্ত দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা ও মদতের অভিযোগ, তাঁকে কি সকলের প্রণম্য মা সারদার সঙ্গে তুলনা মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়ার মতো বিষয়!

নির্মল মাজিকে আটকে রাখা যায় না। মানুষের হাসপাতালে কুকুরের ডায়ালিসিস করানোর আবদার ধরেছিলেন তিনি। সেই মতো তোড়জোড় করেও শেষ মুহূর্তে উদ্যোগটি ভেস্তে যায়। চেয়েছিলেন, তাঁর ডাক্তারি-পড়ুয়া ছেলের পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের সিসিটিভি-ক্যামেরা যেন বন্ধ করা থাকে। এবং ছেলে যেন নিজের মর্জিমাফিক জায়গায় বসে উত্তর লিখতে পারে!

তাঁর গুণের শেষ নেই। এই তো কিছুদিন আগের কথা। চিকিৎসক-বিধায়ক নির্মল মাজি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করলে স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরিতে 'বাড়ি যেখানে বদলি সেখানে' নীতির সুবিধা পাওয়া যাবে না। মেদিনীপুর শহরে ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালে হোমিয়োপ্যাথির এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'চিকিৎসক, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, টেকনিশিয়ান— যাঁর বাড়ি যেখানে, পোস্টিং হোক সেখানে, এই আওয়াজ আমিই তুলেছি। এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু (এই সুবিধা) তাঁদের জন্য নিশ্চয়ই নয়, যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করেন, কথায়-কথায় পান থেকে চুন খসলে যাঁরা জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ করে সরকারের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেন।'

এমন বক্তব্যের পর স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে রাজনীতির অনেকেই অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু দিদি কিচ্ছুটি বলেননি। এই বারেও তিনি চুপ। তবে কি দিদি নিজেও এমনটা মনে করেন যে তিনিই একালের মা সারদা। তাই কি তিনি নির্মল মাজিদের ক্ষমা করে দেন এই ভেবে যে, তিনি সতের মা, অসতেরও মা।

কিন্তু আমি একটু অন্য কারণে চিন্তিত। এই ভাবে কোনও ঐতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে, যাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের অনেক আবেগ, শ্রদ্ধা, তাঁকে নিয়ে এমন বলা যায় কি! তার কি কোনও প্রতিবাদ হবে না? মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করাই শুধু নয়, এটা কি ধর্মীয় আবেগেও আঘাত নয়! যাঁর বিরুদ্ধে আদ্যপ্রান্ত দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা ও মদতের অভিযোগ, তাঁকে কি সকলের প্রণম্য মা সারদার সঙ্গে তুলনা মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়ার মতো বিষয়!

ক্ষমা করবেন মা সারদা। □

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এক যোদ্ধা

ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আয়ুষ্কাল মাত্র বাহান্ন বছরের হলেও তাঁর কাজের পরিধি সুবিশাল। শ্যামাপ্রসাদের সর্বশেষ ঐতিহাসিক উদ্যোগ ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় জনসঙ্ঘ আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী। শ্যামাপ্রসাদ-প্রতিষ্ঠিত দলটি আত্মপ্রকাশের কয়েক দশকের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির খোলনলচে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে তাঁর দূরদর্শিতাই প্রমাণ করে। যে বীজ তিনি অপরিসীম বিরোধিতা ও বাধা উপেক্ষা করে বপন করেছিলেন, কিংবা অন্যভাবে বললে, মাত্র ১০ জন সঙ্গীকে নিয়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন— এখন তা ১১ কোটি রাজনৈতিক কর্মীর এক শক্তিশালী প্লাবনে পরিণত হয়েছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে সব থেকে কমবয়েসি ছিলেন। মাত্র ৪৬ বছর বয়েসে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেটে শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। মন্ত্রীসভায় থাকার সময় এবং মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর রাজনৈতিক জীবনে তিনি বরাবর দেশের জাতীয় স্বার্থ, অখণ্ডতা ও ঐক্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কলকাতা-সহ যুক্তবঙ্গের একটা অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা। এই অংশই আজকের পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান বিগত কয়েক দশকে বীরগাথায় পরিণত হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় ড. শ্যামাপ্রসাদ সেই সময়কার বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী এবং দলমত নির্বিশেষে অনেক রাজনৈতিক নেতার সমর্থন পেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে একটি রাজ্য থাকুক যেখানে বাঙ্গালি হিন্দুরা আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। ভারতে বাঙ্গলার একটি অংশ টিকিয়ে রাখার এই লড়াইয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র

মজুমজদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টজনেরা। এই ঘটনা সেই সময়ের বাঙ্গালি সমাজে ড. শ্যামাপ্রসাদের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। একথা অনস্বীকার্য, তিনি রাজনীতিতে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যদিও পুরো ছবিটা এরকম ইতিবাচক নয়। তখন বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী এইচ.এস. সুরাওয়ার্দি। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙে জিন্নার ডানহাত ছিলেন এই সুরাওয়ার্দি। অথচ সুরাওয়ার্দির কথায় প্রভাবিত হয়ে শরৎচন্দ্র বসুর মতো নেতা তখনও স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাঙ্গলার হয়ে ওকালতি করে চলেছেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন এই প্রস্তাব হিন্দু বাঙ্গালি ও বাঙ্গলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক সংগ্রামের পর ড. শ্যামাপ্রসাদ ঘটনার স্রোতকে উলটোখাতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কার্যত তিনি পাকিস্তান ভাগ করেছিলেন। পরে, এক বিখ্যাত চিঠিতে তিনি এই বিষয়ে নেহরুকে লেখেন, 'আপনি ভারত ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।'

সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ প্রচলিত রাজনীতির বিপরীতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি না করলে, তাদের কপালে কী জুটত— সে কথা নিশ্চয়ই আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙ্গালিরা অনুভব করতে পারে। যদিও ড. শ্যামাপ্রসাদের অবদান প্রসঙ্গে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে যে অখণ্ড নীরবতা পালন করা হয়— তা খুবই দুঃখের। একমাত্র যাঁরা ড. শ্যামাপ্রসাদের আদর্শের উত্তরাধিকারী তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং চর্চা করেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদের আরেকটি অবিস্মরণীয় অবদান জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা জনসমক্ষে তুলে ধরা। যদিও এই কাজ করার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। তিনি বোধহয় তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষুতে দেখতে পেয়েছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ময়দানে পরিণত হবে এবং সেখানে দেশের জাতীয় স্বার্থ ও অখণ্ডতা বিরোধী নানা শক্তি পুষ্ট হবে। তিনি এও বুঝেছিলেন, এত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যদি ভারতের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ হারিয়ে ফেলে তাহলে সেইদিন খুব দূরে নয় যেদিন জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত থেকে আলাদা হবার দাবি উঠবে। আর এই দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থার ইন্ধন জোগাবে পাকিস্তান-সহ অনেক দেশ। তাঁর বোঝায় কোনও ভুল ছিল না। ভারতের ভবিতব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর তিনি তাই একাই দেশের জাতীয় সংহতি রক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই একক সংগ্রাম এবং শেষপর্যন্ত তার পরিণতি অর্থাৎ স্বাধীন

২৩ জুন, ১৯৫৩। রাত্রি ৯.৩০ মিনিটে দমদম এয়ারপোর্টে বিমান থেকে নামানো হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ।

দেশে বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু দেশকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদ, চরমপন্থা— মোদ্দা কথায় সন্ত্রাসবাদের চেহারাটা ঠিক কেমন হতে পারে? এটাও বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদ এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে আরও কদর্য চেহারায় সে বারবার আসবে।

ভারতের সার্বভৌমত্বের কথা উঠলেই ড. শ্যামাপ্রসাদের আত্মত্যাগ, অসীম সাহস, অনমনীয় অবস্থান ও অদম্য মানসিকতার ছবিটি ভেসে ওঠে। জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গ তা অনেকটাই তাঁর জন্য। বস্তুত নিজে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিতটি মজবুত করে দিয়ে গেছেন। একজন যোদ্ধা যেমন যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুকামনা করে, ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুও সেরকম। যোদ্ধার মতো। প্রশ্ন জাগে, তিনি কি নিজের এরকম পরিণতির কথাই ভেবেছিলেন? কারণ তিনি লিখেছেন, 'আমার মৃত্যু যেন সত্যের জন্য সংগ্রাম করার সময় আসে।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী তাঁকে 'মাতৃভূমির স্বার্থরক্ষায় আপোশহীন যোদ্ধা' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, '...কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।' বীর সাভারকর ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে এক 'অগ্রণী দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ ও জাত সাংসদকে দেখেছেন।' হিন্দুস্থানের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগসূত্র স্থাপনের কারিগর ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ', বলেছেন সাভারকর। তবে সব থেকে হৃদয়স্পর্শ করা মন্তব্যটি সেই সময়ের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, জনসেবক, চিন্তাবিদ, কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য এবং স্বরাজ দলের প্রথিতযশা নেতা এস.আর জয়করের। তিনি লিখেছেন, 'একদা যারা ছিলেন তাঁর (ড. শ্যামাপ্রসাদের) সহকর্মী, তাদেরই নির্দেশে নিজের দেশের বন্দিশালায় বন্দি অবস্থায় মৃত্যু— একজন যোদ্ধার সঠিক পরিণতিই বটে! আমরা আশা করব এই ঘটনা থেকে ভারত সরকার তাদের আচরণের ভয়াবহতা অনুভব করতে পারবে, যা যে কোনও সভ্য দেশের সভ্য সরকারের রীতিনীতি লঙ্ঘন করে অসভ্যতার চূড়ায় পৌঁছে গেছে।'

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারতের লড়াই এখনও চলছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই লড়াইয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তারপর ৬৯ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এই লড়াইয়ে এখন যাঁরা শামিল তাঁদের কাছে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু প্রেরণাস্বরূপ। এত বছর পরেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে দেশের সেবা করার কথা বলে চলেছেন।

(লেখক দিল্লিস্থিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর)।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার কালিয়াচকের আলিপুর রাণাপ্রতাপ শাখার বালক স্বয়ংসেবক আয়ুষ কর্মকারের বাবা টিঙ্কু কর্মকার গত ১৮ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। উল্লেখ্য, প্রয়াত টিঙ্কু কর্মকারও স্বয়ংসেবক ছিলেন।

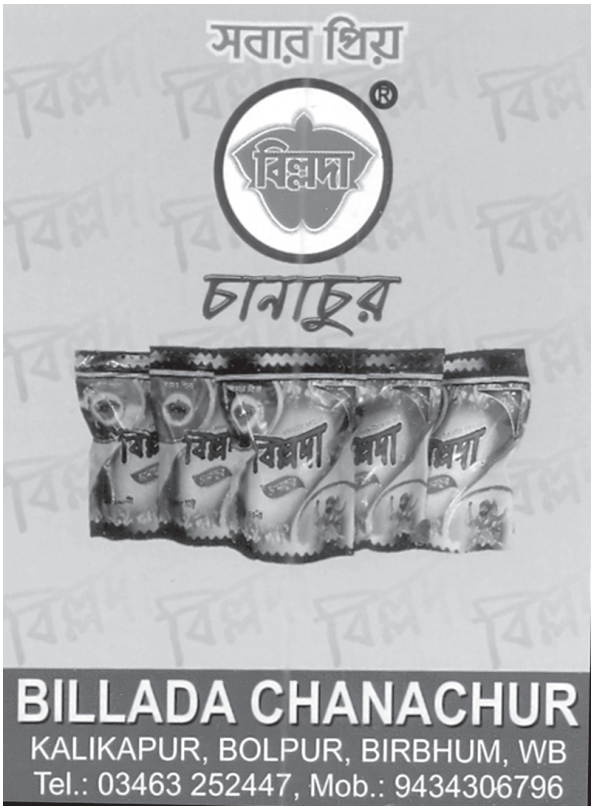

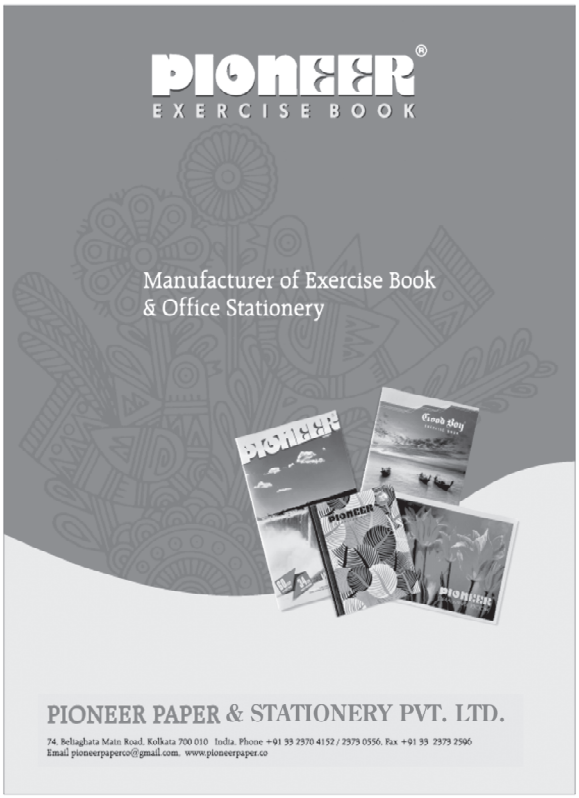

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অগ্নিপথের বিরোধীরা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী নন

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

ভারত সরকরের অগ্নিপথ প্রকল্প আমাদের সেনাবাহিনীকে শুধু সমৃদ্ধ করবে তাই নয়, দেশের যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে। অল্পকথায় বলতে গেলে, এটি ১৭ থেকে ২৩ বছর (শুধু বর্তমান বছরের জন্য, অন্যথায় ২১ বছর) বয়সের যুবকদের জন্য (যুবতীরা নেভির জন্য বিবেচিত হবেন) একটি ঐচ্ছিক ট্রেনিং প্রকল্প। এই প্রকল্পে ছ'মাসের ট্রেনিং-সহ কাজ করার সময় মোট চার বছর। শিক্ষান্তে ট্রেনিদের, যাদের 'অগ্নিবীর' বলা হবে, তাদের থেকে বাছাই করে ২৫ শতাংশকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে স্থায়ী কমিশন্ড হিসেবে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। বাকিরা চার বছরের শেষে সার্টিফিকেট পাবে এবং এই ট্রেনিঙের পরে তাদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থানে সুবিধে হবে। এছাড়া সরকারি কিছু কিছু দপ্তরে যেমন সিভিল ডিফেন্স ইত্যাদি চাকরির ক্ষেত্রে এই অগ্নিবীরদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ কোটা করা হবে। তাদের বছরে প্রায় ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। ভাতার উপর নির্ভর করে মাসে ৯ থেকে ১১ হাজার টাকা কেটে রেখে চার বছরের শেষে সর্বোচ্চ সুদ-সহ করমুক্ত ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। প্রত্যেক অগ্নিবীরের জন্য সরকার ৪৮ লক্ষ টাকার বিমার সংস্থান রাখছে। এছাড়া, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মতো এদেরও ফ্রি রেশন, মেডিক্যাল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

পৃথিবীর বহু দেশ, যেমন সুইডেন, নরওয়ে, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইরান, ইজরায়েল, বারমুডা, সাইপ্রাস, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সিঙ্গাপুর, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়া— এইসব দেশে এমন প্রকল্প আছে। সেগুলো কিন্তু আমাদের মতো ঐচ্ছিক নয়— আবশ্যিক, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নিয়োগ করা হয়। এদের প্রত্যেকের প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সবার মধ্যে আমাদের দেশের প্রকল্পই ট্রেনিদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। তাছাড়া, ট্রেনিঙের শেষে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর স্থায়ী ক্যাডারে যোগদানর সুযোগ এইসব দেশের প্রায় কারোরই নেই। উত্তর কোরিয়াতে তো ১৪ বছরেই বাধ্যতামূলক নিয়োগ করা হয়, চলে ৩০ বছর বয়েস অবধি। তাদের ভাতাও অতি নগণ্য। আমাদের ভাতা রাশিয়ার থেকে বেশি! আমাদের অগ্নিপথ প্রকল্প রাশিয়া, ইজরয়েল, ইরান ও তুরস্কের থেকে অনেকটাই ভালো।

তবু কিছু রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। হিংসাত্মক বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য হিসেবে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার উসকানি দিচ্ছেন। কংগ্রেস দলের পারিবারিক সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দলকে অগ্নিপথের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই— ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করা। সোনিয়া গান্ধীর বাবা, স্টেফানো মাইনো ছিলেন রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের অনুগামী তখনকার ইতালির বেশ কিছু মানুষ রাশিয়ার অনুপ্রেরণায় ইতালিয়ান কমিউনিস্ট দল গঠন করে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালির সৈন্যদলে যোগ না দিয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আবার সেই রাশিয়াতে কিন্তু আইনমাফিক সামরিক ট্রেনিং বাধ্যতামূলক! বিহারের এক কমিউনিস্ট নেতা যিনি আবার জেহাদি ইসলামের সমর্থক বলেছেন, অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিল করতে হবে! আমি সরাসরি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি, ক্ষমতা থাকলে একই রকম প্রকল্প চালু রাখার জন্য রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া আর তাদের বিশেষ বন্ধু দেশ তুরস্ক ও ইরানকে এমন প্রকল্প চালু রাখার জন্য নিন্দা করে বিবৃতি দিক— সে ক্ষমতা এসব বিদেশি রাষ্ট্রশক্তির দালালি করা কাগুজে নেতাদের নেই। ভারতের প্রতিরক্ষা দুর্বল করার চেষ্টা একটি কারণেই করা— পাকিস্তান ও চীনের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করা। একই কথা সোনিয়া গান্ধীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

> গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে ভারতবিরোধী শক্তির হাতে তামাক খাওয়া রাজনীতিবিদদের শত বাধা সত্ত্বেও একাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে— জেহাদি শক্তি যেন কোনোভাবে এর সুযোগ নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে না পারে।

এখানে একটি তথ্যের অবতারণা করা বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে। তাহলো, গত কয়েক বছরে দেশে অনলইন কোচিং সেন্টার বা কোচিং কোম্পানিগুলির বাড়বাড়ন্ত। এদের এক-একটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ বিশাল! এতে বিদেশ থেকেও মোটা অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং রাজ্য বিশেষে হাজার হাজার কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেয়! এদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আলাদা করে কোনো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও বিহারে অগ্নিপথ প্রকল্প বিরোধী মুখ্য চরিত্র হিসেবে এমনই কোচিঙের মালিকদের নাম উঠে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এইসব কোম্পানির modus operandi এবং এদের অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা। এরা বিভিন্ন ট্রেনিং ও পেশার ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির পরীক্ষারও তালিম দেয়— অবশ্যই উচ্চহারে ফি নিয়ে। পরীক্ষার কৃতকার্যতার কোনো নিশ্চয়তা নেই!

অগ্নিপথ প্রকল্পে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

ফঃ ২

অগ্নিবীরদের খাওয়া থাকা-সহ বিভিন্ন পরিষেবা একদম ফ্রি। মেয়াদ অন্তে ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরের স্থায়ী ক্যাডারে চাকরির সুযোগ থাকায় এদের মধ্যে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকবে। যেসব অগ্নিবীর সেনাবাহিনীতে স্থায়ী চাকরি পাবে না, তারা বিভিন্ন সরকারপোষিত ও সরকারি সংস্থায় চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ পাবে। এছাড়া তাদের ট্রেনিঙের কারণে তারা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পাবে। যারা ব্যবসা করতে চায়, সেসব অগ্নিবীরদের মূলধনের জন্য ব্যাংকগুলি সহজ প্রকল্পে তাদের মূলধন জোগাবে। অন্য কোনো দেশ কিন্তু এই সুবিধা দেয় না।

এক অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করা হচ্ছে— চার বছর ট্রেনিঙের পর সবাইকে নাকি স্থায়ী চাকরি দিতে হবে! কমিউনিস্ট-সহ যে সব বিরোধী রাজনীতিবিদ একথা বলছেন, তারা তাদের শাসনে থাকা রাজ্যে কিন্তু কোনো ট্রেনিং বা কোর্স করার পর স্থায়ী চাকরি দেননি বা দেওয়ার কোনো প্রকল্প করেননি। সদ্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় পাশ করা হয়েছে একটি ট্রেনিং প্রকল্প, যেখানে ট্রেনিং শেষে চাকরির কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, শুধুমাত্র ট্রেনিংকালে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে, অবশ্যই অন্য কোনো সুবিধাছাড়া। পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী চাকরিগুলি তুলে দিয়ে শুধু চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বিনা ট্রেনিঙে নিযুক্ত 'সিভিক' পুলিশের চুক্তিভিত্তিক বেতন মাসিক পাঁচ হাজার টাকা, আবার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোর 'সিভিক' শিক্ষকেরও মাসিক বেতনও পাঁচ হাজার টাকা। এখানে 'অনুপ্রেরণা'য় চাকরি হয় বা যায়। এখান থেকে যখন অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা-বাণী শুনতে হয়, তখন একটিই পুরানো প্রবাদ মনে পড়ে— 'চোরের মায়ের বড়ো গলা'। এইসব যারা করে, তারা যখন 'অগ্নিপথ প্রকল্প'কে আটকাতে হিংসাত্মক ও ধ্বংসকারী আন্দোলনকে উসকানি দিয়ে বক্তব্য রাখেন, তখন দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তারা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছেন শুধু ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানার জন্য— শত্রুদেশের 'হাতে তামাক খাওয়া'র জন্য। এরা কেউই কমিউনিস্ট দেশ ও ইসলামি দেশগুলির বাধ্যতামূলক (conscripted) সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলে না বলেই এদের ভারতের জাতীয়তাবোধ বিরোধী অভিপ্রায় বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই বিরোধীরা আমাদের সেনাবাহিনীর দীর্ঘ সময় ধরে চালু ব্যবস্থার কথা কিছু বলছে না। আমাদের সেনাবাহিনীতে দু' ধরনের কমিশন্ড হয়। একটি পার্মানেন্ট বা স্থায়ী— এখানে অফিসাররা তাদের র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী ও চাকরির সময় অনুসারে তাদের চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করেন এবং অবসরগ্রহণের পর পেনশন পান। আবার বড়ো সংখ্যায় মানুষ সেনাবাহিনীর সব বিভাগেই শর্ট কমিশন্ড হিসেবেই সার্ভিস দেন। এদের বাহিনীতে বিশেষ কয়েকবছরের সার্ভিস দেওয়ার কথা। তারপর এঁরা যখন সেনাবাহিনী থেকে সরে যান, এককালীন exgratia-সহ এঁরাও অবসরকালীন টাকা পান। সেইসঙ্গে এরা যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারী চাকরিতে— এমনকী ক্যাডার ভিত্তিক। AS ও IPS-এও যোগ দিতে পারেন। এঁদের জন্য সংরক্ষিত কোটার প্রবন্ধন করা আছে। সোনিয়া গান্ধীর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য— আপনার স্বামী, শাশুড়ি ও দাদাশ্বশুর প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় যে সিস্টেম চালু ছিল, আপনি কি তার বিরোধিতা করছেন? এই অগ্নিপথ প্রকল্প তো শর্ট কমিশন্ড সর্ভিসেরই আধুনিক ও উন্নততর সংস্করণ। এর বিরোধিতা করা মানুষজনের মোটিভ ও তাঁদের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, তাঁরা কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের দলের বিরোধিতা করার অছিলায় ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করছেন, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক।

অগ্নিবীরদের তৈরি করার মাধ্যমে ভারতের যুবশক্তির মধ্যে জতীয়তাবোধের চারাগাছ রোপণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্যই একাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে ভারতবিরোধী শক্তির হাতে তামাক খাওয়া রাজনীতিবিদদের শতবাধা সত্ত্বেও। আরেকটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে— জেহাদিশক্তি যেন কোনোভাবে এর সুযোগ নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে না পারে। □

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে '**বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস**' নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০্ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
VIVEKANAND ROAD
Kolkata - 700 006

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ

বিজয় আঢ্য

বছরখানেক আগে কলকাতা পোর্টট্রাস্টের এক অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ট্রাস্টের নাম বদল করে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে 'শ্যামাপ্রসাদ পোর্ট ট্রাস্ট' হিসেবে ঘোষণা করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (১৯০১-১৯৫৩) বর্তমান ভারতে একটি সুপরিচিত নাম। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, বাঙ্গালি হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে অগ্রণী, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের অন্যতম ত্রাণকর্তা এবং কাশ্মীর রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী এক পুরুষ। এরকম একজন ভারতীয় মনীষীর নাম অনুসারে নামকরণ হলেও কয়েকটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করে। শ্যামাপ্রসাদ 'সাম্প্রদায়িক'— তাদের অভিযোগের তকমা বজায় রাখার জন্যই এই বিরোধিতা। ভোট রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও স্বার্থান্বেষী মহল বরাবর মুসলমান তোষণনীতি চালিয়ে এসেছে। খিলাফত আন্দোলনে যার শুরু বর্তমান 'সিএএ' বিরোধিতার নামে শাহিনবাগ আন্দোলনেও তা চলছে। ড. শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী-সহ দেশের বহু বিশিষ্ট গুণীজনেরা উপস্থিত থাকলেও এই রাজ্যের বামফ্রন্টের ও সরকারের কেউ উপস্থিত হননি। সম্প্রতি তৃণমূল সরকার চাঁদসদাগরের মনসা পূজার মতো শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণ করেছে। ক্ষমতার লালসা মানুষকে যে কত অকৃতজ্ঞ করতে পারে, তা দেখে মর্মে মর্মে পীড়া অনুভব হয়।

পাশাপাশি গত ৯৫ বছর ধরে হিন্দুত্ব জাগরণের জন্য কার্যরত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে, নিরন্তর বিরোধিতা করা হচ্ছে। ইংরেজ শাসনকালে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির (১৮৩৫) ফলে এদেশে এমন এক জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যারা চেহারায় ভারতীয় কিন্তু আচারেবিচারে, আশা-আকাঙ্ক্ষায় শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপীয়। আর মার্কস-পুত্র কমিউনিস্টরা তো এদেশকে কখনোই এক দেশ, এক জাতি বলে মানেই না। মেকলে-মার্কস পুত্রদের কাজ হলো

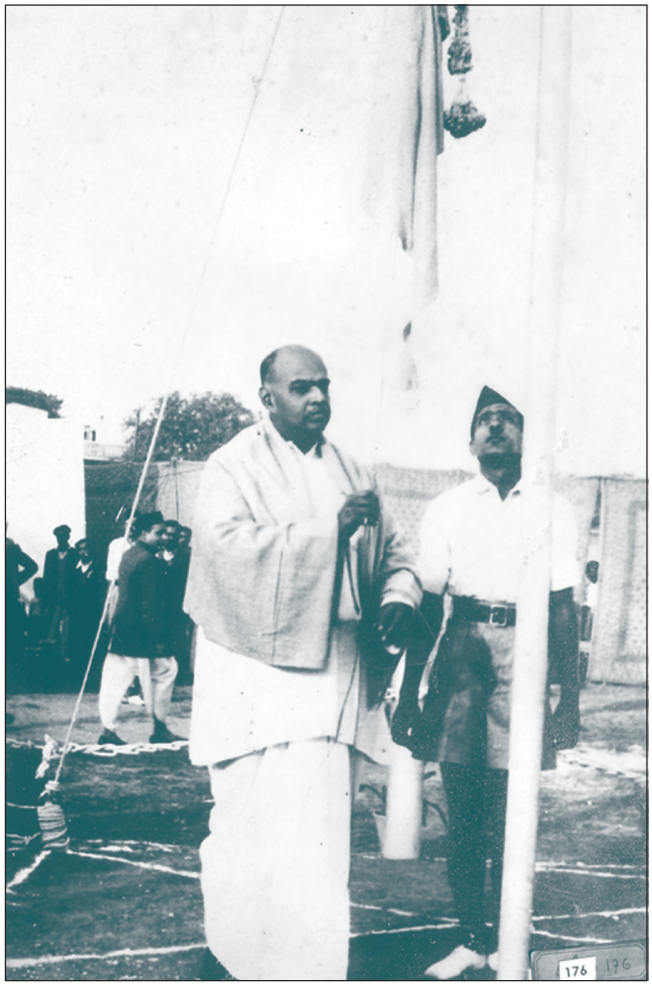

সঙ্ঘের শিবিরে ধ্বজারোহণ করছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৫২)।

হিন্দু বিরোধিতা। স্বাধীনোত্তর ভারতে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত দেশের শাসন রজ্জু এরাই নিয়ন্ত্রণ করত। সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করে সঙ্ঘকে এরা শুধু একবার নয়, তিন তিনবার (১৯৪৮, ১৯৭৫, ১৯৯২) প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। যেখানে যেখানে হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটছে, সেখানে সেখানেই তারা বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। কারণ তারা মনে করে হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটলে জাতীয়তাবোধের জাগরণ হলে তাদের কায়েমি স্বার্থের ও পরিচালিত সরকারের বিপদ হতে পারে। কিন্তু এইরকম বিরোধিতার ফল হলো উলটো। হিন্দুরাও পালটা চিন্তা শুরু করল। বিরাট ভাবে বিজেপিকে তারা জিতিয়ে দিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই সঙ্ঘ ও শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্কের মূল্যায়নের আবশ্যকতা অনুভব হচ্ছে। বিশেষত নবীন প্রজন্ম বিষয়টি নিয়ে চর্চা ও গবেষণা শুরু করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ আর পারাকে চেপে রাখা যায় না। সেরকম সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই। সেই সত্যেরই অরুণোদয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাসে ১৯৪০ সালটি একাধিক কারণে স্মরণীয়। ১৯২৫ সালে বিজয়দশমী তিথিতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংগঠনের যথাযথ অগ্রগতির জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বয়ংসেবকদের আবশ্যকতা অপরিহার্য হয়ে উঠে। ১৯৪০ সালে নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ শিবির 'অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্প-এ (ওটিসি)— প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষ

শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪০০। শিবিরে বঙ্গপ্রদেশ-সহ প্রায় সম্পূর্ণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব ছিল। স্বভাবতই এই প্রগতি দেখে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (ডাক্তারজী) আনন্দিত হলেন। ৯ জুন, ১৯৪০-এর সকালে শিবিরের ঘরোয়া সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ডাক্তারজী যে ভাষণ দেন তা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন— 'আপনারা জানেন যে গত চব্বিশ দিন ধরে আমি রোগশয্যায় পড়ে আছি। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এই বছরটি বড়ো সৌভাগ্যের বছর। আজ আমার সম্মুখে হিন্দুরাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বই দেখতে পাচ্ছি।'

অন্যদিকে ১৯৩৯-৪০ সালে সারা ভারতে হিন্দুসমাজে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত ছিল। সঙ্ঘের হিন্দুত্বের আদর্শবাদ, সংগঠনকুশলতা, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ অবহিত ছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘের প্রতিদিনের কার্যক্রমে স্বয়ংসেবকেরা শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশের যে সাধনায় ব্রতী এবং এর ফলে যে শুভ সংস্কারে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, এই বিষয়ে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সেই সময় বাঙ্গলা প্রান্ত প্রচারক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস, বালাসাহেব নামেই যিনি সুপরিচিত, তিনি ভবানীপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (জানুয়ারি, ১৯৪০) এবং ওই বছরে এপ্রিল মাসে একদিন কলকাতায় সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ করেন। শ্যামাপ্রসাদ সেই আমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করেন। দেওরসজীর নেতৃত্বে এবং স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠা-সহ অভ্যাসের ফলে শ্যামাপ্রসাদকে এপ্রিল মাসে কলকাতায় মানিকতলা সঙ্ঘস্থানে (তখন চতুর্থ সঙ্ঘস্থান তেলকলের মাঠ) সামরিক অভিবাদন দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রমে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেওরসজী তাঁকে আগামী মে মাসে একদিন নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হতে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে বিচার- বিশ্লেষণের প্রস্তাব দেন। দেওরসজীর এই প্রস্তাবে শ্যামাপ্রসাদ সম্মত হন।

ডাক্তারজীর এই গুরুতর অসুস্থতার সময়ে বোম্বাই থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চিঠি এল, যে তিনি ২০ মে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে নাগপুরে আসছেন এবং একদিন থেকে ২১ মে কলকাতা ফিরবেন। সেই সময় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি বোম্বাইতে গেছিলেন এবং ফেরার পথে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে নাগপুরে আসেন। উল্লেখ্য, এই সময় বাঙ্গলায় ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা চলছিল। কথামতো ২০ মে তিনি নাগপুরে এলেন। সেদিন নাগপুরের রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানে বিকেলে ১৪০০ গণবেশধারী স্বয়ংসেবক সম্মিলিত হয়েছিলেন। শাখায় প্রার্থনার পর শ্যামাপ্রসাদের উদাত্ত ভাষণে সবাই অনুপ্রাণিত হয়। এই ভাষণ সম্পর্কে বাঙ্গলার শিক্ষার্থীদের ব্যাচলিডার গোরাদা—জ্ঞানেশ কুমার সান্যাল বহুবার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এরপর ১৪০০ গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের দীর্ঘ পথসঞ্চলন হয়। এই পথসঞ্চলন দেখে শ্যামাপ্রসাদ অভিভূত হন।

এদিন রাত ৯টায় শ্যামাপ্রসাদ ডাক্তারজীর বাড়িতে গেলেন। ডাক্তারজী এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। এই সময় ডাক্তারজীর ১০৩° জ্বর ছিল। এই অবস্থাতেও তিনি কোথা থেকে এত শক্তি ও উৎসাহ পাচ্ছেন— শ্যামাপ্রসাদের এই প্রশ্ন শুনে ডাক্তারজীর সহাস্য উত্তর —'আপনার মতো বড়ো ডাক্তার আমার বাড়িতে আসছেন শুনেই আমার অসুখ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।' তারপর কথাবার্তা শুরু হলো। সেই সময় শ্রীগুরুজী, ভাণ্ডারার শ্রীদাদাসাহেব দেব, আপ্পাজী যোশী এবং নাগপুরের কয়েকজন প্রমুখ কার্যকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর ড. শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলার হৃদয়- বিদারক ঘটনাসমূহের বর্ণনা শুরু করলেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। শ্যামাপ্রসাদ বললেন— এখন বাঙ্গলায় কোনও 'হিন্দুরক্ষা দল' বানানো ছাড়া হিন্দুদের বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।'

তাঁর কথা শুনে ডাক্তারজী আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, আপনি 'হিন্দুরক্ষা দল' তৈরির কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু ইংরেজ ও লিগপন্থী মুসলমানরা কি তাদের চোখের সামনে নিজেদের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে এমন কোনো দল তাঁকে চালাতে দেবে?

একথা শুনে ড. শ্যামাপ্রসাদ চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বললেন, 'তাহলে এই অবস্থায় হিন্দুদের জন্য সঠিক রাস্তা কী?'

ডাক্তারজী অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্তভাবে সঙ্ঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বললেন, 'বাঙ্গলা অথবা পাঞ্জাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা স্থানে হিন্দুদের পক্ষে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ আমাদের সমাজের অসংগঠিত অবস্থা। এই অবস্থাকে স্থায়ীরূপে দূর করা না গেলে, কোনো-না কোনো স্থানে হিন্দুদের উপর এইরকম উপদ্রব চলতেই থাকবে। এর বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়ামূলক তথা আংশিক কোনও উপায়ে পরিস্থিতিকে চিরতরে পরিবর্তন করা যাবে না। এর জন্য সমগ্র দেশের হিন্দুদের মনে সমষ্টিভাব নির্মাণ করা এবং এক রাষ্ট্রীয়ত্বের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের মনে প্রভাব বিস্তার করা দরকার। হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ও রাষ্ট্রকে বৈভবের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নির্মাণ করাই রাষ্ট্রোত্থানের সুষ্ঠু ও স্থায়ী পথ এবং সঙ্ঘ সেই পথই অনুসরণ করে চলেছে।'

প্রসঙ্গক্রমে ড. শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবও করেন যে সঙ্ঘের এবার রাজনীতিতে প্রবেশ করা উচিত। ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন যে, সঙ্ঘ প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। ডাক্তারজী শ্যামাপ্রসাদের কাছে এই আশাও প্রকাশ করেন যে কিছুদিন আগে বাঙ্গলায় যে সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়েছে, সে কাজ যদি তাঁর মতো ব্যক্তির সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করে, তাহলে সঙ্ঘের কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উন্নতি করবে এবং হিন্দুদের রক্ষা ও সহায়তার ব্যবস্থা নিজে থেকেই হয়ে যাবে। ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাসপূর্ণ তথা মৌলিক চিন্তাভাবনায় ড. শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং যখন তিনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন দুজনে পরস্পরের দিকে এমন আত্মীয়তার দৃষ্টিতে দেখছিলেন যে শব্দের দ্বারা তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

১৯৩৯-৪০ সাল শ্যামাপ্রসাদের

জীবনেরও একটা 'টার্নিং পয়েন্ট'। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে ধরার জন্য ১৯২৯ সালে 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটস কনস্টিটিউয়েন্সি' থেকে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এ তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদের তখন পর্যন্ত খুব একটা আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। যদিও তাঁর শৈশবকাল থেকে ওই সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে ঘটে যাচ্ছিল একের পর এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে পর পর দু'বার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। উল্লেখ্য, তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের পরোক্ষ সমর্থনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে হিন্দু নির্যাতন শুরু হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সদস্য হিসেবে সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধি হলো— কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ রাজনীতি হিন্দুদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাহলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের স্বার্থ কে দেখবে— এই চিন্তা শ্যামাপ্রসাদকে ভাবিয়ে তুলল। বীর সাভারকরের সঙ্গে একান্ত আলাপ-আলোচনার পর তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করলেন এবং ১৯৩৯ সালে কলকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আর পরের বছর ১৯৪০ সালে ওই দলের তিনি সভাপতিও হলেন। উল্লেখ্য, ওই বছরই মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-এর (Two Nation Theory) ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামিক দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হলো। কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিল— 'The Pakisthan is a just, Progressive demand.'

পূর্ব পাকিস্তানে অধুনা বাংলাদেশের পাবনা বনমালী ইনস্টিউট হলে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এর বিকেলে হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহারাজা শশীকান্ত আচার্য-চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক বিশাল সভা হয়। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে ড. মুখার্জি হিন্দু মহাসভার আদর্শ ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'আজ আমরা দেখিতেছি, আমাদের উপর আঘাতের পর আঘাত আসিয়া পড়িতেছে— অন্য কোনও অপরাধে নয়, একমাত্র অপরাধ এই যে, আমরা বাঙ্গলার হিন্দু। এই আঘাত হইতে আমরা নিজেকে মুক্ত করিতে চাই। কেহ যদি আমাদের আঘাত না করে, আমরাও আঘাত করিব না। কিন্তু অন্যায় আক্রমণ যদি আমাদের উপর হয়, তবে মরণপণ করিয়া সংগ্রাম করিব।' (স্বস্তিকা : শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা : ৪.০৭.২০০৫)

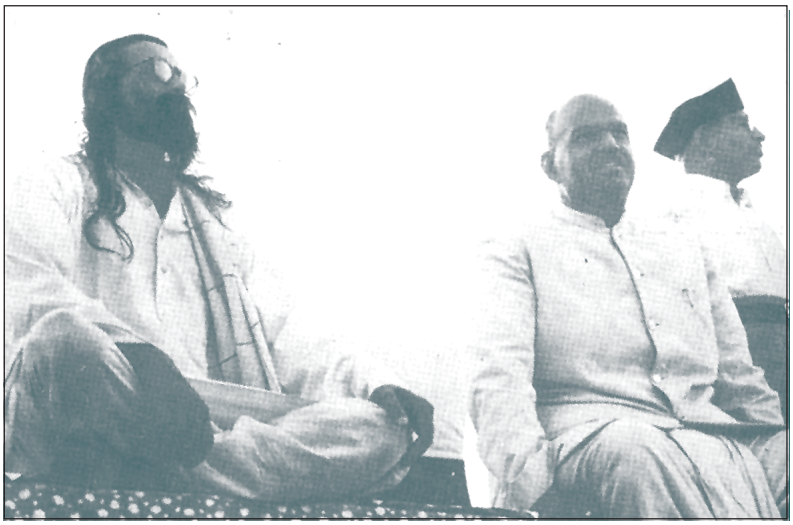

শ্রীগুরুজী ও শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে রাঁচিতে বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'ইহাতে সন্দেহ নাই যে জাতীয় দাবি পূরণের চেষ্টায় হিন্দুর অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশি। হিন্দু জানে, স্বরাজে তাহার জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার লাভের আদর্শ হিন্দুকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তার জন্য যে বহু দুঃখ, বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাই আপনারা এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান--- হিন্দু সংগঠন।' (স্বস্তিকা : ৭.৭.২০০৩ : পৃ. ৫-৮)

১৯৫২-তে 'পূর্ববঙ্গে নূতন জেহাদ' শীর্ষক এক নিবন্ধেও তাঁর একই ভাবনার প্রকাশ। তিনি লিখছেন, 'পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দুদিগের দুর্দশার তুলনা জগতের ইতিহাসে মিলে না। অন্যরকম অত্যাচারের কথা বাদ দিলেও কেবল নারীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইতেছে বা হইয়াছে, কোনও সভ্য জাতির ইতিহাসে তাহা ঘটে না। কুখ্যাত নোয়াখালির বর্বরতা হইতে আরম্ভ করিয়া আজও পাকিস্তানে সেই একই কাহিনি শোনা যাইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের কর্তব্য ভুলিব না। ভারতের হিন্দুজাতির সামগ্রিক মৃত্যু এখনও ঘটে নাই। পশ্চিমবঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে অন্তত কিছু সংখ্যক হিন্দু আছেন, যাঁহারা দেশের, জাতির ও ধর্মের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ আজীবন করিয়া যাইতে বদ্ধপরিকর।' (স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা, ১৯৫২)

১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কালপর্বে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের গুণে ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেকে এক অনন্য পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই কালপর্বে তাঁর বহুমুখী কর্মসাধনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি এইরকম : ১৯৪১ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় ত্রাণ ও অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পালন; ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে ঝড় বন্যার জন্য উপযুক্ত ত্রাণ সহায়তা না করার এবং সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে ওই মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ; ১৯৪৬ সালে হিন্দুস্থান জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন এবং বাঙ্গলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত; এই বছরেই হাসান সোহরাবর্দি

সরকারের চরম নিষ্ক্রিয়তা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর বিরুদ্ধে একক সংগ্রামী ভূমিকা পালন এবং ফজলুল হক ও শরৎ বসুর নেতৃত্বে অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠনের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ; তাঁর চেষ্টায় মূলত হিন্দুদের জন্য ভারত ইউনিয়নের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের সৃষ্টি; ১৯৪৭ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীরূপে যোগদান এবং ১৯৫০-এ নেহরু-খিলাফত চুক্তি পালিত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ (কলকাতার দাঙ্গা), ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ (নোয়াখালিতে হামলা), ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ (দেশভাগ), ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ (পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার) মতোই ৮ এপ্রিল ১৯৫০ (নেহরু-লিয়াকত চুক্তি) দিনটি জাতীয়জীবনে একটি কালো দাগ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই চুক্তি বাঙ্গালি হিন্দু জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্বের বন্ধন ছিন্ন করে উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। ইংরেজের চক্রান্ত, মুসলিম লিগের দাবি, কমিউনিস্টদের দ্বিচারিতা এবং জাতীয় নেতাদের গদির লোভ ও অদূরদর্শিতার জন্য ভারত বিভাজন যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তান গঠন রোধ করার আর কোনও উপায় ছিল না, তখন ড. শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অথচ এই মানবপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ ভারতে পরিচিত হলেন সাম্প্রদায়িক হিসাবে!

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাতের মাত্র কয়েকদিন পর ২০ জুন, ১৯৪০, ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর একদিন আগে শ্রীগুরুজীকে (এম এস গোলওয়ালকর) সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক হিসেবে তিনি মনোনীত করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগ এবং স্বাধীনতার নামে যা পেলাম তা আসলে কেবল শাসন করার অধিকার। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও পঞ্জাব থেকে নির্যাতিত হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতবর্ষে আশ্রয় নিলেন। তাদের সহায়তা করার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে বাঙ্গলায় 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি' এবং পঞ্জাবে 'পঞ্জাব রিলিফ কমিটি' গঠিত হলো। অর্থাৎ এই কালপর্বে সঙ্ঘ তার মূল কাজ 'ব্যক্তি নির্মাণ'-এ অটল থাকলেও স্বয়ংসেবকেরা সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। এই সময় সর্দার প্যাটেলের আগ্রহে (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল) শ্রীগুরুজী কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের বিলয়ের বিষয়ে সম্মতি জনিয়েছিলেন। সঙ্ঘের প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হওয়ার কারণে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন শাসক দল কংগ্রেস শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার অভিযোগে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের কাজ স্থগিত ঘোষণা করেন। পরে ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে স্বয়ংসেবকেরা দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন (যা গান্ধীজীরই প্রদর্শিত পথ) শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ১১ জুলাই ১৯৪৯, সরকার নিঃশর্তে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এরপর শ্রীগুরুজীর পথনির্দেশে সঙ্ঘের কাজ সর্বব্যাপী ও সর্বস্পর্শী করার জন্য স্বয়ংসেবকেরা সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন শুরু করেন। ১৯৫২ সালে গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনে সারা দেশ থেকে স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্বে পৌনে দু' কোটি হস্তাক্ষর সংগ্রহ করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে পেশ করা হয়। আর ১৯৫৩ সালে শ্রীগুরুজী বলেন, কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে যদি কোনও জনমত সংগ্রহ করতে হয় তবে তা সারাদেশ জুড়েই হওয়া দরকার, শুধুমাত্র কাশ্মীরে নয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক ক্রমে কীভাবে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তা ১৯৫৬, ২৬ জুন দিল্লি থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'-এ প্রকাশিত শ্রীগুরুজীর লেখা থেকে জানা যায়। শ্রীগুরুজী লিখেছেন, 'আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে সৌভাগ্যক্রমে নাগপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ চলছিল। আমি ছিলাম তার সর্বাধিকারী। সেই সময় মুম্বাইয়ে আয়োজিত হিন্দু মহাসভার বৈঠকে যোগদানের পর ফেরার পথে তিনি মূলত ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নাগপুরে এসেছিলেন।

ড. মুখার্জির সরলতা এবং বিরুদ্ধ মতের বক্তব্যও সহানুভূতিপূর্বক বোঝার যোগ্যতা— প্রধানত এই দুটি গুণের জন্য আমি তাঁর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হই। তিনি নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকতেন এবং কেউ যদি তাঁর প্রাণপ্রিয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিপরীত কোনও জোরদার যুক্তি উপস্থাপন করতেন তবে তিনি তা মেনেও নিতেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক কাজ হতে দূরে থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়েও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ক্বচিৎ আমি হয়তো উত্তেজনাপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য পেশ করেছি— তখনও লক্ষ্য করেছি ড. মুখার্জি এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে শান্তই থেকেছেন। এই গুণ সচরাচর দেখা যায় না। এর ফলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

১৯৪০-এর মে মাসের এই সাক্ষাতের পর আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তখন জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের আলোচনাও হয়েছে। তিনি যখন সত্যনিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে এটা লক্ষ্য করলেন যে, কোনও রাজনৈতিক দলই দেশে বসবাসকারী অহিন্দুদের উপেক্ষা কিংবা ত্যাগ করতে পারবে না, তখনই তিনি হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করলেন তবুও আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁর হৃদয়ে ছিল হিন্দুমহাসভার প্রেরণাস্রোত। অবিচল দেশভক্ত স্বাতন্ত্র্যবীর ব্যারিস্টার বিনায়ক দামোদর সাভারকরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যা ষড়যন্ত্রে হাত আছে— এই অভিযোগে শ্রীসাভারকরের বিরুদ্ধে যখন হামলা হচ্ছিল তখন ড. মুখার্জি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেন, 'একজন মহানতম

সত্যিকারের দেশভক্তকে এভাবে অপমান করা ঘোর অন্যায়।' তিনি বিশ্বাস করতেন যে শাসকদল প্রতিশোধমূলক মনোভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে এঁদের জনপ্রিয়তা খতম করে দিতে চাইছিল। কারণ এঁরা শাসক দলের বিপরীত মত পোষণ করতেন এবং ভিজে বেড়ালের মতো তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে চাইতেন না।

এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বের যাত্রা। যখন আমাদেরই রক্ত সম্পর্কের ভাই-বোনেরা পূর্ববঙ্গে অবর্ণনীয় ও অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা পীড়িত হচ্ছিলেন, নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হচ্ছিলেন এবং সেইসময় তাদের ভারতে আশ্রয়ের সন্ধান করতে হচ্ছিল, তখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সম্মান ও লাভের পদে আটকে থাকা নয়। তারপর তিনি ভাবতে শুরু করেন যে, এখন কী করা যায়। রাজনীতির প্রতি যে ব্যক্তির বিশেষ রুচি আছে, তিনি তো তেমন রাজনৈতিক দলই খুঁজবেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আদর্শের ও দৃষ্টিকোণের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন।

সেইসময় যতগুলি রাজনৈতিক দল ছিল তার কোনটাকে তিনি পছন্দ করতেন না। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক তোষণকারীর রাস্তা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। তিনি মনে করতেন কংগ্রেস দেশের দুর্ভাগ্য ও অপমানের কারণস্বরূপ হয়ে গিয়েছে। তিনি হিন্দু মহাসভা ছেড়েছিলেন সেকথা তো আগেই বলেছি। আদর্শ ও কর্মসূচির কষ্টিপাথরে সমাজবাদী পার্টি এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি কোনও প্রকার শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে এমনটি দেখা যাচ্ছিল না। সাম্যবাদী দলে যোগদান তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ ওই দল অরাষ্ট্রীয় দেশবহির্ভূত, রাষ্ট্রবহির্ভূত এবং রাজ্য বহির্ভূত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল। সেই সময় যতগুলি রাজনৈতিক দল ছিল তার কোনো একটাও তাঁর প্রতিভার অনুকূল ছিল না। সেইজন্য দেশ-বিদেশের পরিস্থিতির অনুরূপ একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতটা আছে তার বিবেচনা করার জন্য নিজের চারিদিকের অবস্থা বিশ্লেষণ করছিলেন।

সাভারকরের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ।

সেই সময় আমার এক পুরানো সহযোগী যাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মে বিশেষ রুচি দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত ড. মুখার্জি সহায়তা পেতে চাইছিলেন। ফলস্বরূপ এই বিষয়ে নিয়েই আমাদের মধ্যে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিষয়ে আলোচনাও হয়। সঙ্গত কারণেই এই বলে তাঁকে সচেতন করেছিলেন যে সঙ্ঘকে যেন রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা না হয়। সঙ্ঘ কোনও রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে থাকতে চায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৫০ সালের অক্টোবরে কলকাতা ২৬নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমানে বিধান সরণি) শ্রীগুরুজী ও ড. মুখার্জি একবার মিলিত হয়েছিলেন। রাজ্যসভায় বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ প্রফুল্ল গোড়াডিয়া সামাজিক মাধ্যমে (https://thewire.in/politics/why-the-Jan-Sangh-was- politically-unsuccessful-in-indias- first-generel-elction) এই তথ্যটি জানিয়েছেন। বাঙ্গলার প্রবীণ প্রচারক ও বর্তমানে স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ চন্দ্র মণ্ডলও বলেছেন, বাঙ্গলার প্রয়াত সঙ্ঘচালক অধ্যাপক অমল কুমার বসুও [যিনি বাঙ্গলার প্রান্ত-প্রচারক (১৯৫০-১৯৬০) ও পরে প্রান্ত কার্যবাহ] এই তথ্যটি তাকে জনিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে কর্মরত কোনও সংগঠন তখনই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যখন তারা কোনও রাজনৈতিক দলের লেজুড় না হয়ে কাজ করবে। এই ভূমিকা তাঁর সঠিক বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি একথাও পরিষ্কার করে দেন যে নতুন দলের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তাঁকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যেখানে অন্য কারও দাস হয়ে কাজ করার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না।

এই মৌলিক বিষয়গুলির উপর সঙ্ঘ এবং প্রস্তাবিত নতুন দলটির মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ার পর এটা স্থির করা প্রয়োজন ছিল যে কোন্ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রাখবে এই নতুন দল। ড. মুখার্জি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা হিন্দু মহাসভা একটি সাম্প্রদায়িক দল।' আমি তাঁর এই বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে

বলেছিলাম, সঙ্ঘ হিন্দু মহাসভার মতো অতটা তীব্র না হলেও তাদের মতোই হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাস করে। তাহলে তিনি কি সঙ্ঘকেও হিন্দু মহাসভার মতোই নিজের থেকে দূরে রাখবেন? তেমনটি হলে তিনি আমার সহযোগী কার্যকর্তাদের, যাঁরা হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা পোষণ করে থাকেন, তাঁদেরও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

তিনি স্বীকার করেন যে, ওই মন্তব্য তিনি অনবধানতাবশত করেছিলেন। তিনি হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের সংবিধানের মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি এবং তার সঠিক বাস্তবায়নও হয়নি।' তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, হিন্দুরাষ্ট্রকে তার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে দেওয়া আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী নয়। কারণ হিন্দুরাষ্ট্র দেশের সকল নাগরিককে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য সমান আশ্বাস দিয়ে থাকে। এই আশ্বাস তারা অহিন্দু সম্প্রদায়কেও দিয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো তারা দেশদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত হবে না, রাষ্ট্রকে তার সর্বোচ্চ গৌরবের আসন থেকে ষড়যন্ত্র করে হটানোর চেষ্টা করবে না, অথবা ওই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষাও রাখতে পারবে না। তিনি তাঁর নিজের নতুন দলের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নীতির উল্লেখ করতে গিয়ে উক্ত তথ্যসমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

যখন আমাদের উভয়ের মধ্যে মতৈক্য হয়, তখন আমি আমাদের মধ্য থেকে এমন কিছু নিষ্ঠাবান ও পোড় খাওয়া সহযোগীদের চিহ্নিত করলাম, যাঁরা নিঃস্বার্থ, কৃতনিশ্চয়ী তথা নতুন দলকে বিশাল ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করার এবং অখিল ভারতীয় স্তরে তার ব্যাপ্তি ও লোকাপ্রিয়তা অর্জন করানোর যোগ্যতা রাখেন। এই ভাবে ড. মুখার্জি তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেন।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হলে শ্রীগুরুজী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ৭ ফেব্রুয়ারিতে লেখা সেই চিঠির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো :

"...I learnt of your success in the elections considering the prevalling atmospher, the pointed and concentrated counter-propaganda against the party you represnt by no less a person than our respected Prime Minister Pandit Jawaherlal Nehru, your success is ocular proof that party with all its apparent reverses is fairly on the way to becoming the beloved idol of the people, representing them, serving them and in the political field, making the country great and prosperous. Allow me to heartily congratulat you upon your spectacular victory." (পত্ররূপ শ্রীগুরুজী (হিন্দি), প্রকাশক : ভারতীয় বিচার সাধনা নাগপুর, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯৬)

ড. মুখার্জিকে আমাদের কিছু উচ্চমানের কার্যকর্তা দেওয়ার পর সঙ্ঘের নিয়মানুসারে আমি স্বয়ং জনসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ গতিবিধি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। তবুও পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝেই যখন আমাদের দু'জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতো তখন তিনি জনসঙ্ঘের অগ্রগতি এবং আগামী কর্মসূচি বা আন্দোলনের খবরাখবর আমাকে দিতেন। আমিও সঙ্ঘকার্যের জন্য তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করতাম। তিনিও আবশ্যকতানুসারে আমাদের কাজে খোলাখুলি সহযোগিতা করতেন। তাঁর জন্যই সম্পূর্ণ কাশ্মীর না হোক, তার যে অংশ আজ আমাদের দিকে আছে, তা আমাদের মাতৃভূমির সঙ্গেই যুক্ত থাকতে পেরেছে এবং এই জন্য জনসঙ্ঘ লাভ করেছে অক্ষয়কীর্তি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর শরীর আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি কালজয়ী।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রায় সত্তর বছর হলো গত হয়েছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৭৭-তে জনতা পার্টিতে বিলীন হয়ে যায়। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগ দেয়। কিন্তু জনতা পার্টির একাংশ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জনতা পার্টির একই সঙ্গে সদস্য থাকা অর্থাৎ দ্বৈত সদস্য পদে (Dwell Membership) থাকা যাবে না বলে দাবি জানালে পূর্বতন জনসঙ্ঘের সদস্যরা জনতা পার্টি ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠন করে। আজ সেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একবার নয়, দু'বার কেন্দ্র সরকারে আসীন। রাষ্ট্রের প্রায় সব সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদগুলিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। দেশের মানচিত্রের অধিকাংশ এলাকাই গৈরিক রঙে রঞ্জিত। ইতিমধ্যেই ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে, মুসলমান নারীদের নির্যাতন ও অসম্মানের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিন তালাক প্রথা রদ করা হয়েছে, হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ বিল পাশ করানো হয়েছে, সর্বোপরি গত ৫০০ বছর ধরে হিন্দুরা অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য যে সংগ্রাম করে চলেছে, দেশের শীর্ষ আদলতের রায়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্মাণ চলছে। বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ উপেক্ষা ও বিরোধিতার স্তর অতিক্রম করে সঙ্ঘ (আরএসএস) আজ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, তারা বিবেকানন্দের হিন্দুত্বকে স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্ঘ বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিন্দুত্বকে স্বীকার করেন না। কিছু লোক আবার নরম (সফট) হিন্দুত্ব, কঠোর (হার্ড) হিন্দুত্বের কথা বলছেন। কিন্তু সফট হিন্দুত্ব বা হার্ড হিন্দুত্ব ইত্যাদি আলাদা আলাদা হিন্দুত্ব বলে কিছু হয় না। হিন্দুত্ব একটাই। এই চেতনা যত দ্রুত ও যত বেশি পরিমাণে জাগ্রত হবে ততই আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র তথা মাতৃভূমি ভারতবর্ষ পরম বৈভবসম্পন্ন হয়ে উঠবে, সঙ্ঘ ও ড. শ্যামাপ্রসাদের চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি করে উপলব্ধি হবে।

তথ্যসূত্র :

স্বস্তিকা : শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা
(১৯৫৪ থেকে ২০১৮)

(লেখক স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক)

সম্পাদকীয় ত্রুটি

গত ১৬ মে-র স্বস্তিকায় 'রাতের বুক চিরে ছুটে চলল সুভাষের গাড়ি' লেখাটিতে মুদ্রণ প্রমাদের সম্ভাবনাময় কয়েকটি শব্দ পড়লাম 'সুভাষের ওয়ান্ডারা' (সফরের গাড়িটির ব্রান্ড নাম) এটি তৎকালীন মটোর গাড়ির নাম অনুযায়ী 'জার্মান ওয়ান্ডরার সেডান' (Wanderer Sidan) যাকে গাড়ি উৎপাদকরা সেডান বডি বলে থাকে। কথাটি দু'বার মুদ্রিত হয়েছে। বাল্যকালে বিদ্যালয় থেকে নেতাজী ভবন দেখাতে নিয়ে গেলে এই গাড়িটি অবশ্য দ্রষ্টব্য ছিল।

দ্বিতীয়, ধর্মতলায় ঠিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর না হলেও সে সময়ের অতি পরিচিত বিশাল 'কমলালয়ের' সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভবত ধর্মতলা স্ট্রিট ও ম্যাডান স্ট্রিটের মুখে সব সময় ভিড়ে ঠাসা 'ওয়াচেল মোল্লার' দোকানটিকে 'ওয়াদেন মোল্লা' লেখা হয়েছে। ওয়াচেল মোল্লার খুচরো ও পাইকারি দোকান ছিল। একটি সম্ভ্রান্ততার প্রতীক। যুগব্যাপী লালিত এই স্মৃতি-সরণীগুলিকে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া কাম্য নয়।

এবার আর একটু গুরুভার অঞ্চলে যাওয়া যায়, 'লক্ষ ডানকান, ক্যালে, লে হাভার'। এই ডানকান অঞ্চলটি ঠিক কোথায়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও চার বছরের অধিক সময় জার্মান অধিকৃত থাকা ফ্রান্সে ডানকার্ক বলে একটি বন্দর শহর আছে, বাকি দুটি স্থানও ফ্রান্সেই। জার্মান Panzer বাহিনী বিপুল বিক্রমে এই ডানকার্কের উপকূল আক্রমণ করে তাদের নাস্তানাবুদ করে দেয়। সময়টা ২২ মে ১৯৪০। এগুলি ইতিহাস খুঁড়ে বড়ো ইতিহাসবেত্তার কাজ করা নয়। এসব বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসেই রয়েছে। এই সময় হঠাৎই জার্মান বাহিনীর কমান্ডার Gerd von Rundstedt (Army group-A) ২৩.৫.৪০-এ ঐতিহাসিক 'Halt order' দেন। যুদ্ধ সাময়িক থেমে যায়। বহু ইংরেজ ও ফরাসি সৈন্য নানা নৌ পোতের মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। ২৬.৫.৪০ তারিখেই আদেশ প্রত্যাহৃত হয় ও ডানকার্ক অধিকৃত হয়ে যায় ৪.৬.৪০-এ চার বছরের জন্য। এই নিয়ে বহু সমরবিশারদের বহুবিধ দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা আছে। ওই জেনারেল হিটলারকে বুঝিয়েছিলেন বহু Tank বসে গেছে এগুলির Maintenance-এর জন্য কয়েকদিন সময় চাই। হিটলার নাকি রাশিয়ায় আক্রমণের 'Operation Barbarossa' চালু করার আগে চার্চিলকে সঙ্গে পাওয়া যায় কিনা বাজিয়ে দেখছিলেন।

তাহলেই তিনটি অঞ্চলই ফ্রান্সের উপকূলবর্তী সেখান থেকে ব্রিটেন কাছে হলেও চার্চিলকে প্রাণে মারার রোমহর্ষক গল্প কোথা থেকে এল? ৮৪ বছরের ফরাসি সেনাধ্যক্ষ মার্শাল পেতেঁকেও হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আত্মসমর্পণের রেল কামরায় অপমানের বদলা নিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স দখলের পর অবমাননাকর আত্মসমর্পণ করিয়েছিলেন। হত্যা করেননি। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান চার্চিলের 'কিছুদিনের জন্য প্রাণে বাঁচার' রোমহর্ষক তথ্য একেবারেই পরিতাজ্য। চার্চিল প্রাণ বাঁচাতে ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলওয়েতে রাত কাটাতেন যাতে জার্মান 'লুফুৎওয়াফা'র (বোমারু বিমান) বোমা এড়ানো যায়। এ বিষয়ে বহু যুগের গবেষণালব্ধ ড. প্রসেনজিৎ বসু ও অনুপ ধরদের বই ধরে ধরে নাড়াচাড়া করা যেতে পারে। আর নেতাজী সম্পর্কে গান্ধীর প্রশংসা নিতান্তই অবান্তর বা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার চেষ্টা। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী নির্বাচনে জেতার পর গান্ধীর 'পট্টভী সীতারামাইয়র পরাজয় আমার পরাজয়' ঘোষণা ভারতে প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্র নির্মাণের প্রথম বীজ, যা সুভাষকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তাঁর দেশপ্রেম কখনই গান্ধীজী অনুমোদন-সাপেক্ষ নয়। গান্ধী অবশ্য তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকে মানসপুত্র জওহরলালকে গদিতে বসান। নির্ভুল তথ্যের জন্য স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কাছে আর একটু সতর্কতা প্রার্থনা করি।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

হাওড়ার জনজীবন তিনদিন ধরে স্তব্ধ রইল কেন?

একটি সামান্য ঘটনাকে কীভাবে অসামান্য করে তোলা যায় তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নূপুর শর্মার সাম্প্রতিককালের একটি উক্তির বিরোধিতা। অন্যান্য প্রদেশ নয়, এই পশ্চিমবঙ্গেই দাঙ্গাবাজ ও বিভেদ সৃষ্টিকারীরা হাওড়ার একটি অঞ্চলে পথ অবরোধ করে গাড়ি, বাড়ি, দোকানঘর ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগ করে নিজেদের যে শক্তি প্রদর্শন করল তা পুলিশ অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে বাধ্য হলো। এরপর পুলিশের ওপর কোনও ভরসা রাখতে পারবে সাধারণ মানুষ? মনে হয় না। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের নীরবতা বিস্ময়কর মনে হওয়াটা কি অস্বাভাবিক? পথ অবরোধ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে, আসন্ন প্রসবা প্রসূতিকে হাসপাতালে পৌঁছতে না দিয়ে পথেই প্রসব করাতে বাধ্য করল দুষ্কৃতীরা। ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর, হৃদরোগ আক্রান্তরোগীর অ্যাম্বুলেন্স পথেই আটকে দিল যারা, গাড়ি, বাড়ি, দোকানঘর পুড়িয়ে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করল যারা, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার বা পুলিশ কী ব্যবস্থা নিল কিছুই প্রকাশিত হলো না। হাওড়ার কয়েকটি অঞ্চলে এই দুষ্কৃতীরা তিনদিন ধরে যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়েছিল, কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দল হলে পুলিশ ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিত আর জলকামান দিয়ে স্নান করিয়ে বাস ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে তাদের হাজতবাস করাত। হাওড়ার কয়েকটি অঞ্চলে এই তাণ্ডবনৃত্য চলার পরও পুলিশের এই নিস্পৃহ আচরণ রহস্যজনক মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় কি? আরও বিস্ময়কর হলো গঙ্গার এক পাড়ে হাওড়ার কিছু অংশে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত তখন গঙ্গার অপর পাড়ে পানিহাটিতে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ হিন্দু দইচিঁড়ে উৎসবে অংশ

নিতে ব্যস্ত। প্রচণ্ড গরমে এবং অত্যধিক ভিড়ে তিনজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর দেহাবসান ঘটেছে। এটা অন্যদের কাছে খুবই মর্মান্তিক, কিন্তু গঙ্গার অপর পাড়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তা তারা জানে না, জানতে আগ্রহীও নয়।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

একটি উপন্যাস এবং অনেক কথা

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি লিখেছিলেন বিখ্যাত কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মালো সম্প্রদায়ের লেখককে অনেক উপহাস শুনতে হয়েছিল। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে জেলের ছেলের আবার লেখাপড়া, এইরকম কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। অদ্বৈতের পিতা অধরচন্দ্র বর্মণের তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে অদ্বৈত হলেন দ্বিতীয়। শৈশবেই লেখকের পিতা-মাতা ও পরে দুই সহোদরের মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র বিধবা বোন অল্পবয়সেই মারা যায়।

লেখকের যখন কুড়ি বছর বয়স তখনই তিনি সংসার বন্ধনহীন একেবারে একা হয়ে পড়েন। তিনি অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিতাস নদীর তীরবর্তী দরিদ্র অসহায় মালো জেলেদের প্রতিও লেখকের সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য ছিল অপর্যাপ্ত। তিতাস একটি নদীর নাম ছাড়াও লেখক রাঙামাটি ইত্যাদি, শাদা হাওয়া উপন্যাস এবং একটি অনুবাদ গল্প লিখেছেন।

১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ১৯৫৬ সালে 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা ছিল অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ ছিল বিপুল ও বহু বিষয়ধর্মী। লেখকের অকালপ্রয়াণের পর তাঁর সংগৃহীত বইপত্র রামমোহন লাইব্রেরিতে দিয়ে দেওয়া হয়।

—সঞ্জয় ব্যানার্জি,
চুঁচুড়া, হুগলী।

প্রসঙ্গ দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

দেশের ১৬তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি দু'ভাবে বিভিক্ত। (১) এনডিএ ও তার সহযোগী দল। (২) কংগ্রেস, টিএমসি, সিপিআইএম, সিপিআই, অখিলেশ, লালু, কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের নিপীড়নের সহযোগী দুই দল সমেত অন্যান্য কিছু সুবিধাবাদী দল। এই দুই গোষ্ঠীভুক্ত দলের সামনে দেশের ১৬তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অ্যাজেন্ডা একই। তবু প্রথমপক্ষ এনডিএ যেটায় যতটা জোর দিয়ে চায়, অন্য দল ঠিক সরাসরি তার ততটাই বিরোধী। এবার দেখা যাক প্রথমপক্ষর কী কী সেই অ্যাজেন্ডা? আসলে যা দীর্ঘ উপেক্ষিত, দেশের জন্য করণীয় কাজ।

(ক) দ্রুত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। (খ) এক দেশ, এক আইন চালু। (গ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা : দেশ এক ভীষণ জনবিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে। যাদের সামান্যতম বুদ্ধি আছে তাদের কাছে এটা সহজেই অনুমেয়। আমাদের থেকে চীনের জনসংখ্যা এখনও বেশি। তবে এমনভাবে চললে খুব শীঘ্রই আমরা জনসংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে যাবো। চীনে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যত জন মানুষ বসবাস করে, ভারতে ওই একই পরিমাণ জায়গায় চীনের দু' গুণের বেশি মানুষ বসবাস করেন। তা সত্ত্বেও চীন অনেক বছর আগেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করে। আমরা তাহলে দীর্ঘদিন ধরে তা ফেলে রেখেছি কেন? এর জন্য তো আমাদের অর্থনীতির উপর চাপ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারত্ব-দারিদ্র্য বাড়ছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে দিনে দিনে আমাদের কৃষি জমি কমছে. প্রশ্ন তাহলে, সরকার এতদিনে তা করল না কেন? এর দুটো কারণ। (১) সদিচ্ছার অভাব, (২) দিনে দিনে দেশের মঙ্গলের কথা না ভাবা স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক দলের উত্থান। এরা শুধু ঘোলা জলেই মাছ ধরতে অভ্যস্থ।

(খ) একদেশ এক আইন চালু : পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য আলাদা আলাদা আইন নেই। তা হলে কেন ভারতবর্ষে থাকবে? বেশ কয়েক বছর আগে এক হিন্দু ব্যক্তি ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে। তার প্রথম স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দেখা যায় যিনি গ্রেপ্তার করেন তার ঘরে দুই স্ত্রী বর্তমান। কোর্টে নিয়ে এলে দেখা যায় যিনি বিচার করছেন তার ঘরে তিন স্ত্রী বর্তমান। (ওদের একাধিক বিয়ের আইন আছে যে)। আমরা যারা সভ্য বলে বড়াই করি তারা কি এমন ব্যবস্থা চায়?

(গ) সিএএ : আমাদের দেশ যেমন ধর্মশালা নয় তেমনি ইসলামিক দেশের নিপীড়িত-অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষজন ভারতের নাগরিক হতে চান, ভারত তাদের নাগরিকত্ব দেবে। এটা খুব সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার। এতে এদেশের মুসলমানদের তো কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু দিনের পর দিন দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনের নামে হুজ্জুতি পাকানো হলো কেন?

আজও তারা দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করছে। তবে সুখের কথা শুধু এনডিএ-র হাতে মোট ভোটমূল্যের ৪৮ শতাংশ ভোট আছে। তাদের সহযোগীদের নিয়ে জয় নিশ্চিত। কুচক্রীদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি, হাওড়া-৯।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

শিশুর জীবনে অভ্যাস তৈরি করানোর দায়িত্ব একমাত্র মায়ের

অপরূপা সেন

আজকাল শিশুদের স্কুল থেকে ফিরেই পড়তে বসিয়ে দেওয়া হয় বা টিউশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি একদম ভুল। ভুলে যাবেন না যে, স্কুল থেকে ফিরে বাচ্চা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

বাচ্চারা খুব অমনোযোগী হয়। হাজারো কাজের মাঝে অমনোযোগের কারণটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। তার ওপর ছোটো বয়সেই পড়াশোনার এত চাপ। এতে কখনো সমস্যা এতটাই বেড়ে যায় যে, পড়তে বসার নাম শুনলেই বাচ্চা কাঁদতে শুরু করে দেয়। এই ধরনের সমস্যাগুলি মা- বাবার কাছে খুবই সাধারণ। তবে এড়িয়ে যাবেন তাও কিন্তু নয়। একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার, বাচ্চার মধ্যে অভ্যাস তৈরি করুন। অভ্যাসই আপনার বাচ্চাকে জীবনের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আজকাল ছোটো থেকেই পড়াশোনার খুব চাপ। তার ওপর শুধু পড়াশোনা দিয়েই ক্ষান্ত হন না অভিভাবকরা। পড়াশোনার সঙ্গে নাচ গান, আঁকা অথবা কেরিয়ারের কথা ভেবে কেনো বিশেষ খেলার সঙ্গে বাচ্চাদের জুড়ে দিতেই ভালোবাসেন অভিভাবকরা। এতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা তো যায়, কিন্তু বাচ্চার দিকটাও মা-বাবাকে একবার ভেবে দেখা দরকার। শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছা সবটা দেখেই একজন অভিভাবক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত।

বাচ্চাকে এখন আর পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করা হয় না। মা-বাবারা তাঁদের সন্তান কথা বলতে শিখলেই স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাঁরা ভাবেন বাড়িতে থাকার চেয়ে স্কুলে গিয়ে প্রাথমিক বিষয়গুলো তারা বরং শিখতে পারবে। এই চিন্তাধারা আধুনিক দিনে একদম ঠিক। আজকার প্লে-স্কুলগুলোকে এভাবেই তৈরি করা হচ্ছে। স্কুল থেকে ফিরে আবার বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য একজন টিউটর রাখা হচ্ছে। যাতে তারা অ আ ক খ সবটাই শিখতে পারে। মাত্র দুবছর বয়সে সকালে উঠে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আবার বিকেলে টিউটরের কাছে পড়াতে বসা — এই রুটিন আপনার কাছে সহজ মনে হলেও ওইটুকু বাচ্চার কাছে এটা খুব চাপের।

একটা ক্ষেত্রে আপনি বাচ্চাকে একটু বেশি সময় দিন। বাচ্চাকে টিউটরের কাছে ছেড়ে না দিয়ে ওকে দিনের একটা সময় পড়তে বসানোর অভ্যাস তৈরি করুন। ছোটো বাচ্চাকে পড়াতে বসানো খুব চাপের, প্রথম দিকে ও হয়তো আপনার কাছে পড়তে বসতেও চাইবে না। তারপরও আপনাকে ওই দায়িত্বটা নিতে হবে। বাচ্চাকে নিজে পড়ানোর অভ্যাসটা খুবই দরকার। এতে আপনি ওর সমস্যাগুলো বুজতে পারবেন। মনে রাখতে হবে, একটা বাচ্চার পড়াশোনার ভিত এই সময় তৈরি হয়। অনেক অভিভাবকই কর্মরত। তবু দিনের একটা সময় বাচ্চার পড়াশোনার ওপর নজর আপনাকে দিতে হবে।

অভিভাবকদের বাচ্চার সঙ্গে একটু খোলামেলাভাবেই মেলামেশা করা উচিত। অবসর সময়ে বাচ্চার সঙ্গে গল্প করুন, ওকে জিজ্ঞেস করুন স্কুলে ওর কজন বন্ধু, তাদের জন্মদিন কবে। এতে বাচ্চার সঙ্গে মা-বাবার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই অভ্যাসের মাধ্যমে আপনি বাচ্চার প্রতিদিনকার বিষয়গুলো সহজেই জেনে যাবেন। বাচ্চাকে বোঝার দায়িত্বটা অভিভাবক হিসেবে মায়ের নিজেরই নেওয়া উচিত। কথায় কথায় বাচ্চাকে মারধর বা বকাঝকা করা উচিত নয়। এতে বাচ্চা জেদি হয়ে যেতে পারে। বাচ্চার মধ্যে অভ্যাস গড়ে তোলাটা খুবই জরুরি। মা-বাবা ছাড়াও বাড়ির প্রত্যেকেরই উচিত বাচ্চার এই দায়িত্বটা নেওয়ার। কোনো একটা জিনিস থেকে বিরক্তি এসে যায় এমন ব্যবহার বাচ্চার সঙ্গে করবেন না।

বাচ্চার কিছু বলার আগেই সমস্যাগুলো বুঝে নিন। ওর সুবিধা মতো ওর সঙ্গে মেলামেশা করুন। ধরুন, সকালে টিউশন থেকে ফিরে স্কুলে যাওয়া, তারপর স্কুল থেকে ফিরেই কিছু খেয়ে আবার পড়তে বসানো —এই রুটিন থেকে আপনার বাচ্চা হয়তো খুব ক্লান্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় একটু চিন্তাভাবনা করে সমস্যার সমাধান করুন। এতে আপনার সন্তানের কাঁধ থেকে চাপের বোঝাটা কমে কমে যাবে। মা তার বাচ্চার সবদিকটাতেই নজর দেয়— এই বিষয়টা একটি বাচ্চার জানা খুব জরুরি। এভাবে যদি আপনি সন্তানকে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সন্তান আপনার মনের মতো করেই বড়ো হয়ে উঠবে। ▯

Maithan Alloys Ltd.

ISO 9001:2008 COMPANY

Registered Office
Ideal Centre, 4th Floor
9, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 017
T (033) 4063 2393, F (033) 2290 0383
E office@maithanalloys.com
W www.maithanalloys.com
CIN : L27101WB1985PLC039503

Works:
Unit-1 : P.O. Kalyaneshwari-713 369
Dist. - Burdwan (West Bengal)
Unit-2 : E.P.I.P. Byrnihat,
Dist.- Ri-bhoi-793 101 (Meghalaya)
Unit-3 : Plot No. 42 & 43, APSEZ
P.O. Atchutapuram, Dist.-
Visakhapatnam- 531 011 (AP)

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

CIN : L92142WB1946PLC013138

Regd. office :
9A, Esplanade East
Kolkata - 700 069
Phone : 2210-8763
2248-3613
Fax : 033-2243-0751
E-mail : info@mkgroupindia.biz

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999
www.mkpoint.in

স্বামী প্রণবানন্দের রাজনৈতিক প্রতিরূপ ড. শ্যামাপ্রসাদ

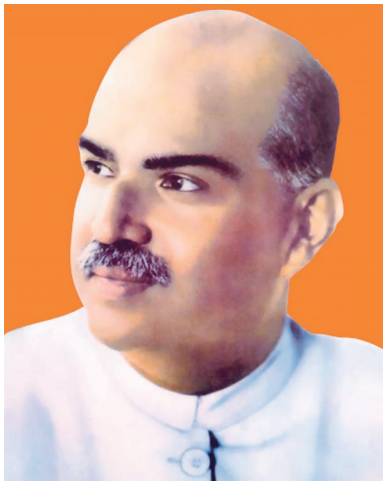

ড. কল্যাণ গৌতম

শিবাজীর গুরু ছিলেন রামদাস স্বামী। তাঁর জন্য সাতারা দুর্গ জয় করার পর সজ্জনগড়ে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজীমহারাজ (১৬৭৩)। গুরুকে অঢেল ধন ও ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে শিবাজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন তিনি। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী সমগ্র মহারাষ্ট্র রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এরজন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন, তৈরি হলো দানপত্র।

পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হলেন, স্বয়ং মারাঠা রাজ তথা হিন্দু-অস্মিতা শিবাজী গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে গুরু মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম; এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগসুখী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জমিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। এমনই রাজ্যশাসনের দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' ছত্রপতি শিবাজী মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে শিবাজীর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত এক যোগী-রাজ্যে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বসন দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

২.

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দু জাতি-গঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দু সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি এবং হিন্দু সমাজের বিপন্নতার বিষয় তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলমান আধিপত্যবাদ বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত সন্ত্রাস সৃষ্টি করছিল; তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে স্বামী প্রণবানন্দজী বললেন, 'ছত্রপতি শিবাজী ও শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতি-গঠন- আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।' তাঁর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যাকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশার মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। স্বামী প্রণবানন্দজী এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বীরদের। 'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।' ত্রিশূল হাতে আচার্যদেব মঞ্চে সর্বদা সমাসীন থাকতেন, পরিধানে পীতোজ্জ্বল কৌষেয় বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কণ্ঠে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। তাঁর সাফ কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' আগের দিন ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনেও বললেন, 'আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতো, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায় স্বধর্ম ও স্বসমাজের রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জাতি-গঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।' বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য হৃদয়ে দুর্দম সংকল্প প্রবাহের জন্য ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে তিনি আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন--- 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মারাঠী ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।'

এরপর দেখা যায় যুগাচার্য হিন্দুদের পাশে সতত অবস্থান করবার এক প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতার সন্ধানে রত হলেন, যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি সঞ্চারিত আছে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন আপন মাল্যে বরণ করে নিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে, নিজের সামুহিক-শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন, বাঙ্গালির জন্য এক শিবাজী-প্রতিম নেতা নির্বাচন করে গেলেন। ওই বছরই শৈবপীঠ বারাণসীতে দুর্গাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডেকে নিয়ে জাগালেন তার মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। প্রণবানন্দ জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থে খোলাখুলি লিখেছেন, 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের

মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়। ...আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ- শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙ্গলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। ...বাঙ্গলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মাধ্যমে এইরূপে আচার্যের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালি জাতির রক্ষার সংকল্প রূপায়িত হইয়াছিল।'

৩.

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'মহামৃত্যু কী?' (What is Real Death?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্ম-বিস্মৃতি' (Forgetfulness of the 'self)। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্ম-বিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে', আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশে বাঁধা মুক্তির দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখবে! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি এবং শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তানসন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এর জন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। ▯

শ্যামাপ্রসাদের বলিদানের পর শ্রীগুরুজীর প্রতিক্রিয়া

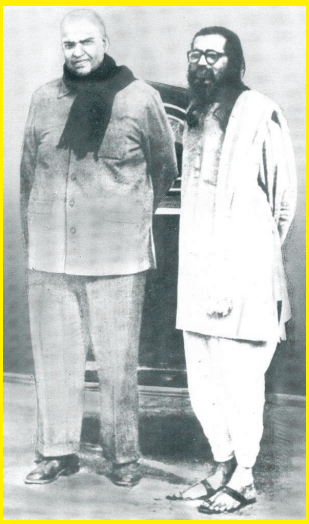

গুরুজী অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়র আত্মবলিদানের পর একটি প্রবন্ধ লেখেন। শিরোনাম 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি'। সেখানে তিনি শুরুতেই দেখিয়েছেন, দেশের কোটি কোটি ভাই-বোন পূর্ববঙ্গে অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে, বাসভূমি ছেড়ে উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয়ের খোঁজে এলেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন। জনসেবাই যে জীবনের লক্ষ্য, লাভজনক পদে আটকে থাকা নয়, এই দৃঢ়তা ব্যক্ত করলেন। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে শ্রীগুরুজী তথা সঙ্ঘের ধারণা এমনই ছিল। ধারণাটি হচ্ছে স্বদেশের হিতে সর্বদা শ্যামাপ্রসাদের পণ এবং জীবনপণ।

শ্রীগুরুজী তাঁর রচনায় শ্যামাপ্রসাদকে দেবোপম মহামানব রূপে দেখিয়েছেন। খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করেছেন জনসঙ্ঘ স্থাপনার কথা। তার প্রধান হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের অন্তর্ভুক্তি, সঙ্ঘ, জনসঙ্ঘ সম্পর্ক এবং কালজয়ী কীর্তির কথা। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে গুরুজী বলেছেন, 'বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।' লিখেছেন, ''একবারই তিনি আমার সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরামর্শ না করে নিজের বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেটা তাঁর পক্ষে প্রাণঘাতী প্রমাণিত হলো।''

ভবিতব্যের আশঙ্কা করে শ্রীগুরুজী চাইছিলেন, ডঃ মুখার্জি যেন কাশ্মীরে না যান। যদি তিনি যান, তাহলে আর ফিরে আসবেন না। তিনি যাতে সেখানে না যান এমন বার্তা প্রেরণ করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরকম। সম্ভবত বার্তাটি শ্যামাপ্রসাদের পার্ষদদের মধ্যেই হারিয়ে গেল। কারণ তাঁরা সূর্যালোকের আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত ছিলেন। দুঃখ করে শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, ''পরিণামে আমার একটি আধারই চলে গেল! তাঁর উপর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা সাকার হয়ে উঠছিল। সব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।''

একটি অনুষ্ঠানে ড. এস. রাধাকৃষ্ণন (মাঝে) তাঁর ডানদিকে নেহরু ও বামদিকে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫০)।

সংসদে নেহরুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের দ্বৈরথ

বিনয়ভূষণ দাশ

ব্রিটিশ ক্রিকেট সাংবাদিক এ জি গার্ডিনারের এক প্রবন্ধে বিখ্যাত ক্রিকেটার জাম সাহেব প্রিন্স রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রিন্স অব আ স্মল স্টেট বাট কিং অব আ গ্রেট গেম।' দারুণ সত্যি কথা বলেছিলেন তিনি। স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও কথাটি প্রযোজ্য। মাত্র তিন সাংসদের একটি ছোট্ট দলের নেতা তিনি কিন্তু লোকসভায় সংসদীয় বিতর্কে তিনি বিজয়ী বীর। সংসদের নেতা নেহরুর চেয়ে তিনি বড়ো। অধ্যাপক বলরাজ মাধোক তাকে অভিহিত করেছেন 'সংসদের সিংহ' হিসেবে। ১৯৫২-র নির্বাচিত প্রথম লোকসভায় তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস ছিলেন। ১৯৫২-র প্রথম নির্বাচনে নব গঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ মাত্র তিনটি আসনে নির্বাচিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনে লোকসভায় হিন্দু মহাসভা এবং রামরাজ্য পরিষদের সদস্য সংখ্যাও জনসঙ্ঘের চেয়ে বেশি ছিল। প্রথম লোকসভা গঠিত হবার পরে ড. শ্যামাপ্রসাদ কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে বাকি অন্য দলের সদস্যদের নিয়ে একটি জোট বাঁধার চেষ্টা করেন। বিপরীতভাবে কমিউনিস্টরা কেএমপিপি ও সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে একটি পালটা জোটের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের এই চেষ্টা সফল হয়নি, কারণ কেএমপিপি বা সমাজবাদীরা ওই জোটে রাজি হয়নি।

অন্যদিকে লোকসভার বয়স যখন মাত্রই তিন দিন, সেই সময়ে ড. শামাপ্রসাদ লোকসভার ৩২ এবং রাজ্যসভার ৬ সাংসদকে

বলরাজ মাধোক ড. শ্যামাপ্রসাদকে 'সংসদের সিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন। আর 'জনসত্তা' পত্রিকার সম্পাদক ও সাংসদ অধ্যাপক ইন্দর বিদ্যা বাচস্পতি শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'পণ্ডিত নেহরু দেশচালনা করতে পারেন, কিন্তু সংসদ চালনা করতেন শ্যামাপ্রসাদ।'

নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি সংসদীয় জোট গঠন করেন। হিন্দু মহাসভা, রামরাজ্য পরিষদ, অকালি, দ্রাবিড় কাজাগাম ও কয়েকটি ছোটো দল নিয়ে এই জোট গড়ে উঠেছিল। ছোটো এই দলগুলির জোটে শ্যামাপ্রসাদের মতো কোনো বক্তা বা অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই বাগ্মী শ্যামাপ্রসাদ এই জোটের নেতা নির্বাচিত হন। জোটে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তিনি চাইলেই জোটের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই নিজে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করতেন না। অন্যদেরও সুযোগ দিতেন। নেহরুর সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রয়োজন বোধ করলে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন আর অন্যরাও এতে আপত্তি করতেন না।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংসদের প্রথম দেড় বছর ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ ও জওহরলাল নেহরুর দ্বৈরথের যুগ। যদিও সেই সময়ে সদস্য হিসেবে ছিলেন আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালানি, ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, সি রাজগোপালাচরী, এইচ ভি কামাথ, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনির মতো দিগ্‌গজ সব সাংসদেরা। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুর্দান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত তাৎক্ষণিক উত্তর দেবার ক্ষমতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে কথার লড়াই হতো জওহরলাল নেহরু ও সংসদের অলিখিত নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। নেহরুর জীবনীকার ওয়ালটার ক্রোকারের মতে, সংসদে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সক্রিয় সাংসদ। সংসদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রিপার্ট দেবার ক্ষমতা ও দক্ষতায় তিনি জওহরলাল নেহরুকে ছাড়িয়ে যেতেন।

বিরোধী পক্ষের একেবারে সামনের সারিতে, ট্রেজারি বেঞ্চের মুখোমুখি তাঁর আসন নির্দিষ্ট ছিল। গমগমে গলায় তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালে মনে হতো, তিনিই যেন সভার অধিপতি। সংসদে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখদের সাহায্য ও পুনর্বাসন, ভারত- পাকিস্তান সম্পর্ক এবং তৎকালীন ভারত সরকারের কাশ্মীরনীতি নিয়ে বক্তৃতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তৎকালীন কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশ নেহরুর পাকিস্তান সম্পর্কিত নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা নেহরুর উষ্মার কারণে চুপ থাকতেন। এ সম্পর্কে সাংবাদিক শংকর ঘোষ তাঁর 'হস্তান্তর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁদের অনেকে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতায় তাঁদের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেতেন, তাই শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁরা সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলের চা-কফির আড্ডা ফেলে লোকসভা কক্ষে উপস্থিত হতেন এবং নেহরুর বক্তৃতা যতটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন ঠিক ততটা মনোযোগ দিয়েই শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য শুনতেন। শ্যামাপ্রসাদের বলায় একটা জাদু ছিল এবং সভাকক্ষে তা এমনই একটি মোহ বিস্তার করত যে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে কেউই সেই মোহজাল ভাঙার কথা ভাবতে পারতেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু নেহরু। তবে সংসদের অধিবেশন চলাকালে নেহরু সাধারণত সংসদ ভবনেই থাকতেন। শ্যামাপ্রসাদ ভাষণ দিতে উঠেছেন শুনলেই তিনি লোকসভা কক্ষে হাজির হতেন। লোকসভার সদস্যরা, বিশেষ করে কংগ্রেস সদস্যরা মনোযোগ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য শুনছেন তা নেহরুর পছন্দ হতো না। তিনি মাঝে মাঝেই শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার সময় উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিতেন এবং তখন যে কথা কাটাকাটি হতো তাতে নেহরুর পরাজয় ঘটত।

আসলে জওহরলাল নেহরু ড. শ্যামাপ্রসাদের বাগ্মিতা, তাঁর স্বদেশপ্রেম, সংসদীয় বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা, দেশের প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটি জ্ঞান, দেশের সামনে সমস্যার অনুপুঙ্খ জ্ঞান এবং তাঁর গঠনাত্মক সমলোচনা সম্পর্কে নেহরুর সম্যক ধারণা ছিল। কিন্তু নেহরু ছিলেন সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো এক অহংকারী প্রকৃতির মানুষ। তাছাড়া যে কোনো সমালোচনায় নেহরু ছিলেন অসহিষ্ণু, ফ্যাসিস্টসুলভ মানসিকতায় আচ্ছন্ন। আর এই মানসিকতা তাঁর আরও বেড়ে গেছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মারা যাওয়ার পরে। তিনি নিজে যা স্থির করতেন, সেটাকেই তিনি গুরত্ব দিতেন। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অবসৃত হবার পরে সংসদে কংগ্রেস দলের কেউ তাঁর বিরোধিতা করার সাহস করতেন না।

ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রথম বিরোধিতার মুখে তিনি পড়েন প্রথম সংবিধান সংশোধনের সময়, ১৯৫১ সালে। যদিও মনে রাখতে হবে, তখন ভারতের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের মানুষ আশা করেছিলেন, দেশে একটি নির্বাচিত সরকার আসার আগে সংবিধানের কোনো সংশোধন করা হবে না। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, অনির্বাচিত একটি সরকারের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মৌলিক অধিকারে (অনুচ্ছেদ ১৪, ১৯, ৩১) হস্তক্ষেপ করে, বিধিনিষেধমূলক শর্ত আরোপ করে সংবিধানের 'প্রথম সংবিধান সংশোধন বিল' আনেন। নেহরুর এই উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের ছায়া দেখতে পান। ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংসদকে মনে করিয়ে দেন,আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল, আর ভারতে নেহরুজী প্রথম সংবিধান সংশোধন করছেন মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের জন্য। আসলে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যে কিছু কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের মারা হয়েছিল। ফলে বোম্বাই রাজ্যের বামপন্থী ঘেঁষা পত্রিকা ক্রস রোডস্ এই ইস্যুতে নেহরু সরকারের দমন নীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা করে লিখতে থাকে। ফলে ক্রুদ্ধ নেহরু পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু আদালত এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। আবার দিল্লির অরগানাইজার পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরু সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকে। নেহরু সরকার 'সেন্সরশিপ' চাপাতে চেষ্টা করলে কোর্টের হস্তক্ষেপে তাও করতে পারেননি। ফলে নেহরু আইনের মাধ্যমে এদের বাগে আনতে গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিরোধী প্রথম সংবিধান সংশোধন বিলটি পাশ করিয়ে নেন।

শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাব দেন, নতুন সংসদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংশোধনী বিল স্থগিত রাখতে। শ্যামাপ্রসাদের এই সৌজন্যবোধ ও কর্তব্যবোধ জওহরলাল ও তাঁর পারিষদবর্গের কাছে অবজ্ঞাতই থাকে। কিন্তু সংসদে তাঁর যুক্তি এবং কর্তব্যনিষ্ঠা জওহরলালের দলীয় সতীর্থ এনজি রঙ্গের অত্যন্ত সমীহ আদায় করে নেয়। অধ্যাপক রঙ্গ তাঁর এই ভাষণকে 'one of the most powerful and eloquent

speeches' বলে প্রশংসা করেন। তিনি ড. মুখার্জিকে 'the Indian Burke' বলে উচ্চ প্রশংসা করেন। এই বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যকে প্রশংসা করে The Times of India পত্রিকায় লেখা হয়, 'Mr. Nehru's sentiment was more than outmatched by the impassioned logic of Dr. Mookerjee। লেখক ত্রিপুরদমন সিং শ্যামাপ্রসাদ ও নেহরুর মধ্যের এই বিতর্ককে যুগান্তকারী বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও শ্যামাপ্রসাদের মূল সংসদীয় বিতর্ক কেন্দ্রীভূত ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা, সরকারের পাকিস্তান নীতি এবং নেহরুর জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর প্রথম সংসদীয় ভাষণে উদ্বাস্তু সমস্যা, জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে একটি গুরুতর বাধা।

শেখ আবদুল্লার 'Indian parliament had no jurisdiction over the Kashmir state'-এর তীব্র বিরোধিতা করে নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁর প্রথম সংসদীয় বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন, দলে দলে স্বজনহারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, সর্বহারা হিন্দু ও বৌদ্ধরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন এবং ক্রমে তা বিপর্যয়ের আকার নিয়েছে। অথচ, নেহরু সংসদে তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিপর্যয় একটি কাল্পনিক কাগুজে খবর; পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। শ্যামাপ্রসাদ এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, নেহরুজী বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিরাপত্তাহীন, লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত। এটা উপলব্ধি করতে না পারাটা অপদার্থতা। এই ভুল যেন আর না হয়। শ্যামাপ্রসাদের এই মন্তব্যে নেহরু তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি বলেন, আমার পরিসংখ্যান কি ভুল?

শ্যামাপ্রসাদের উত্তর— অবশ্যই ভুল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে...

নেহরু : যদি আমি প্রকৃত খবর ও সঠিক পরিসংখ্যান দিই?

শ্যামাপ্রসাদ : একটা সাধারণ ভাসা ভাসা খবরের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য করা উচিত নয়। সংসদের কোনও মাননীয় সদস্য যখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে, সত্যিই পূর্ববঙ্গে বিপর্যয় শুরু হয়েছে, তখন একজন দায়িত্ববান প্রধানমন্ত্রীর উচিত উঠে দাঁড়িয়ে বলা যে, বিষয়টি আমরা বিবেচনার মধ্যে রাখছি এবং দেখা যাক এটা কী করে বন্ধ করা যায়।'

নেহরু : 'মাননীয় সদস্য আমার বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন'।

শ্যামাপ্রসাদ : 'এইরকম চ্যালেঞ্জ, বাদপ্রতিবাদ পুরো অধিবেশন জুড়েই চলতে থাকবে।'

বস্তুত, হয়েছিলও তাই। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে এই বাদপ্রতিবাদ চলেছিল শ্যামাপ্রসাদের অবশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনেও। অবশ্যই এই বাদপ্রতিবাদে অধিকাংশ সময়ই নেহরুর পরাজয় হতো, জয়ী হতেন শ্যামাপ্রসাদই। সমস্ত উদাহরণ পেশ করা প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

শুধু একটি বিতর্কের উল্লেখ করেই প্রবন্ধের উপসংহার টানব। সেদিন সংসদে দিনের শেষ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। লোকসভা কক্ষ ফাঁকা, কিন্তু সেন্ট্রাল হল জমজমাট। সভার কাজ চালাচ্ছেন ডেপুটি স্পিকার অনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার। শ্যামাপ্রসাদ মাত্র দু-একটি কথা বলার অনুমতি চাইলেন। তিনি বেশি সময় নেবেন না। শ্যামাপ্রসাদ বলতে চাইলে স্পিকারের অনুমতি পেতে অসুবিধে হতো না। তো, সেদিন শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা শুরু করলে ফাঁকা সভা ভর্তি হতে শুরু করল। সাংসদরা অন্য কাজ ফেলে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা শুনতে লোকসভায় জড়ো হলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদ ভবনেই তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। তিনিও তাড়াহুড়ো করে লোকসভায় ঢুকে তাঁর আসনে বসলেন, চাপরাশি একগাদা ফাইল তাঁর সামনে রেখে গেল আর এদিকে দশ মিনিটের মধ্যেই লোকসভা পূর্ণ হয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদের গলার আওয়াজ ছাড়া লোকসভা কক্ষেও আর কোনো শব্দ নেই। তাঁর দু-একটি কথা আর দশ মিনিটে শেষ হলো না। ডেপুটি আয়েঙ্গার মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে সময় দিয়েই চললেন।

তিনি সরকারি উদ্‌বাস্তুনীতির সমালোচনা করে বলেন, নেহরু সরকারের উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি ও হৃদয়হীন নীতির ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে দিল্লি পুরসভার সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে জনসঙ্ঘের মতো একেবারে আনকোরা একটি দলও চারটি আসন দখল করেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে কংগ্রেস এই নির্বাচনে মদ ও টাকার, ওয়াইন ও মানির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও খোদ দিল্লিতে কংগ্রেস চারটি আসনে হেরেছে। নেহরু চুপচাপ মাথা নীচু করে ফাইল দেখছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডেপুটি স্পিকার এ আয়েঙ্গারকে সম্বোধন করে বলে উঠেন, 'স্যার, মাননীয় সদস্য সংসদীয় রীতি ভঙ্গ করে বলেছেন, 'কংগ্রেস মদ ও নারী— ওয়াইন অ্যান্ড উইমেন-এর ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিল যা রীতিমতো আপত্তিকর'। তিনি অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন শ্যামাপ্রসদকে এই মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। নেহরু বলতে ওঠায় শ্যামাপ্রসাদ বসে পড়েছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঠিক বলেননি। ওয়াইন অ্যান্ড উইমেন তিনি বলতেই পারেন না, তিনি ওয়াইন অ্যান্ড মানি বলেছিলেন। নেহরু একথা মানতে চাইলেন না। কিছু কথা কাটাকাটির পরে শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাব দেন, লোকসভার আলোচনার যে-সরকারি রিপোর্ট তৈরি হয় সেই শর্টহ্যান্ড রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক তিনি ঠিক কী বলেছিলেন। নেহরু এই প্রস্তাবে রাজি হন। পরদিন লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বের পরে নেহরু আগের দিনের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তিনি লোকসভার বিতর্কের সরকারি রিপোর্টে দেখছেন, শ্যামাপ্রসাদ 'ওয়াইন অ্যান্ড মানি'ই বলেছিলেন। 'আমার তখন কী হয়েছিল জানি না। কালকের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত।' নেহরুর মন্তব্যের পর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, তাঁর আর ক্ষোভ নেই। এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সেটা সম্ভব নয়, তাই বিরত থাকছি।

অধ্যাপক বলরাজ মাধোক ড. শ্যামাপ্রসাদকে 'সংসদের সিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন। আর 'জনসত্তা' পত্রিকার সম্পাদক ও সাংসদ অধ্যাপক ইন্দর বিদ্যা বাচস্পতি শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'পণ্ডিত নেহরু দেশচালনা করতে পারেন, কিন্তু সংসদ চালনা করতেন শ্যামাপ্রসাদ।' □

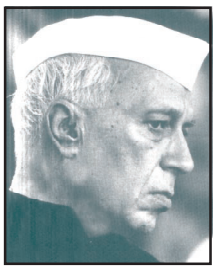

ড. শ্যামাপ্রসাদের রহস্যমৃত্যুর পর জওহরলাল নেহরুকে লেখা যোগমায়াদেবীর চিঠি

প্রিয় নেহরু,

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে আপনার ৩০ জুনের পত্র আমি ২ জুলাই পেয়েছি... আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে সমগ্র রাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত। ...আমার পুত্রের মৃত্যু তখন হয়েছে যখন সে নজরবন্দি ছিল। বিশেষ করে যখন তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিচার চলছিল না তখন তাকে নজরবন্দি রাখা হয়েছিল। ...আপনি আপনার পত্রে সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, কাশ্মীর সরকার আমার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য যথাসম্ভব সবকিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু আপনার স্পষ্টীকরণের কোনো মূল্যই নেই, যখন আমার পুত্রের রহস্যময় মৃত্যুর জন্য যাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো উচিত সে বিষয়ে আপনি নিরুত্তর রয়েছেন। ...আমার পুত্রের মৃত্যুরহস্য কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে। এই মৃত্যুরহস্য আপনার কাছে হৃদয় বিদারক ও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে না কি? শ্যামাপ্রসাদ সামান্য হাঁটাচলার জন্য একটু খোলা জায়গার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিল যার জন্য তার শরীর অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ সুবিধা না দিয়ে তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তাছাড়া সে যখন অসুস্থ তখন চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছিল না। কারণ চিকিৎসা রিপোর্ট সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী, তাই একে চিকিৎসায় অবহেলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি এ পত্র মারফত বিলাপ করছি না বরং ভারতের একজন কৃতী সন্তান কীভাবে মারা গেল তার নিরপেক্ষ এবং খোলাখুলি তদন্ত হোক এটুকুই এক বলিদানী পুত্রের মায়ের একান্ত অনুরোধ। আরো আমি বলতে ইচ্ছুক, এই বিষয়ে আপনার সরকার কেন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল? আমি ভারতের সমস্ত মাতাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আপনি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করুন যার ফলে সত্য উদ্ঘাটিত হয়। এই বিষয়ে ঈশ্বর যেন আপনাকে সৎসাহস প্রদান করেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি আর তার হস্তলিখিত কাগজপত্র আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত জিনিসগুলি অবশ্যই তাদের কাছে আছে।

ভবদীয়া—

দুঃখিনী যোগমায়া দেবী

নিউ দিল্লি

৫ জুলাই ১৯৫৩

ক্রীড়া ভারতী ও ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতায় বিশ্ব যোগ দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১ জুন ক্রীড়া ভারতী এবং ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে মহা সমারোহে যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কলকাতার বিভিন্ন সংস্থার সদস্য, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং যোগপ্রেমী মানুষেরা এতে অংশগ্রহণ করেন। তিনজন যোগ শিক্ষক— নয়ন মণ্ডল, প্রণব সিহি ও রণদীপ বসুর নির্দেশনায় প্রায় দুই হাজার মানুষ সমবেত ভাবে সূর্য নমস্কার-সহ বেশ কয়েকটি যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর রাজ্য সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী অজয় নন্দী, বিশিষ্ট সমাজসেবী রমাপদ পাল, ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক মধুময় নাথ।

শ্রী রাহা ও শ্রী পাল তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে যোগের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থানের নির্দেশক তথা ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ড. অভিজিৎ ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বিভাস মজুমদার, শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার, শ্রীমতী কিরণ চৌরাসিয়া, শ্রীমতী পুনম গৌড়, বিকাশ সিংহ, করণ সিংহ, প্রবীর ঘোষাল প্রমুখ।

মালদহের গাজোলে দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

মালদহ জেলার গাজোল হাজি নাকু মহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গত ৭ থেকে ১৬ জুন দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৫২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর মালদা জেলার সংযোজক শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল। ১৬ জুন শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বর্মন। উপস্থিত ছিলেন সহপ্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণ দেবনাথ, শিক্ষক অশোক ভকত, যোগগুরু নির্মল কুমার সাহা, অনন্যার সভানেত্রী শ্রীমতী সুদীপ্তা সরকার। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক বিলাস মহলাদার। এরপর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সরস্বতী বন্দনা ও সংস্কৃত গীত। শিক্ষার্থী হিসেবে দশদিনের অনুভব বর্ণনা করেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক পঞ্চানন মাহাত ও নারায়ণ সাহা। বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর সংযোজক শিক্ষক জয় সাহা। সংস্কৃত গীত পরিবেশন করেন অনুসূতা মহলাদার ও অরনিশা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরেশ চন্দ্র সরকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কৃতভারতীর গাজোল খণ্ডের সংযোজক সমর বিশ্বাস।

কলামন্দিরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিকোৎসব এবং রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অভিনন্দন সমারোহ

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অন্তর্গত পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া মহানগর শাখার ৪১তম বার্ষিক উৎসব গত ১৯ জুন কলকাতার কলামন্দিরে সম্পন্ন হয়। সুদূর পাহাড় ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী আমাদের বনবাসী-গিরিবাসী ভাইদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট কল্যাণ আশ্রম নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তারা তাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে পঞ্চাশ হাজারের বেশি স্থানে শিক্ষা, সংস্কার, চিকিৎসা, স্বাবলম্বন, সমরসতা ও স্বদেশপ্রেমের দীপশিখা জ্বালিয়ে জনজাতি সমাজকে আলোকিত করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক সভাপতি চুনারাম মুর্মু। প্রধান অতিথি রূপে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল সুশ্রী অনুসুইয়া উইকে এবং বিশেষ অতিথি রূপে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত গুরুমা শ্রীমতী কমলা সোরেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন কলকাতা মহানগরের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র চৌধরী, হাওড়া মহানগরের অধ্যক্ষ শঙ্করলাল হাকিম এবং মহানগর মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা বাগড়ী। অনুষ্ঠানে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রামচন্দ্র খরাড়ীকে তাঁর প্রথমবার কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে ৫০টিরও বেশি বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো এবং সম্মানিত করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি চুনারাম মুর্মু। গুরুমা কমলা সোরেন বলেন কল্যাণ আশ্রমের প্রেরণায় তিনি বহু বনবাসী ভাই-বোনকে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা রামচন্দ্র খরাড়ী বলেন, ভারতবর্ষের বনবাসী ভাইয়েরা এই দেশের হিন্দু সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। তাঁরা হিন্দু নয় বলে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। যখন যখন দেশ, জাতি ও সমাজের ওপর আঘাত এসেছে তখন তখন জনজাতি সমাজের ভাইয়েরা নিজেদের প্রাণ বলিদান দিতেও পিছনা হননি। ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন ১৯ নভেম্বরকে **জনজাতি গৌরব দিবস** রূপে ঘোষিত করায় তিনি ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, ভারতের বিকাশযাত্রা বনবাসী ক্ষেত্র থেকেই হবে। ভারতকে বিশ্বগুরু হতে হলে বনবাসী সমাজের বিকাশ করতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল অনুসুইয়া উইকে বলেন, আজ যেখানে সমাজসেবা স্বার্থবুদ্ধিতে হয়ে থাকে, সেখানে কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তারা নিস্বার্থভাবে জনজাতি সমাজের সেবা করে চলেছেন। তিনি শহরবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জনজাতি সমাজের উত্থানের জন্য শহরবাসীরা এগিয়ে এসেছেন, এটা অভিনন্দনযোগ্য। তিনি নিজে জনজাতি সমাজের একজন হওয়ায় গর্ব প্রকাশ করে জনজাতি সমাজের যুবপ্রজন্মকে বিদেশিদের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কল্যাণ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চুনারাম মুর্মু। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতীর কলাকুশলীদের দ্বারা 'নমামি ভারতবর্ষম্' নৃত্যালেখ্য পরিবেশিত হয়। সূত্রধর ছিলেন ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। ভাষ্যরচনা ও সংগীতে অমিতাভ মুখার্জি। হিন্দি গানে সমাজ কুমার বসু। নৃত্য নিবেদনে সিউড়ীর সৃঞ্জন, নৃত্যরিদম্ এবং গৌড়ীয় চারুকলা ভারতী, কলকাতা।

বিপত্তারিণী ব্রতে শুভ সংখ্যা তেরো

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সদা সন্ত্রস্ত নারী : 'বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ'। সেই মধু-মনে রয়েছে অফুরন্ত মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা। শুধু স্বামী-পুত্র-পরিবার নয়, প্রতিবেশী, সমাজ এমনকী সমস্ত মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় যেন নিদ্রাবিহীন রাতের নারী। তারা যত সহজে এবং আন্তরিকতায় সকলকে আপন করে নিতে পারে, তেমনটা পারে না আর কেউ। সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় অতুলনীয় বাঙ্গলার নারী। শুধু সুখে বা আনন্দ-উৎসবে নয়, সমান দরদে সকলের আপৎকালেও এগিয়ে আসে নারী। অসুস্থ সন্তানের শিয়রে রাত্রি জাগা জননীর মতোই এই মর্ত্যজীবনে এক সুমহান ভূমিকায় রয়েছে নারী।

এত ভালোবাসা, এত কোমল মনের অধিকারী হয়েও বাঙ্গলার নারী সতত সন্ত্রস্ত। প্রতি মুহূর্তেই একটা ভয়ের অক্টোপাশ যেন তার আটটি শুঁড় দিয়ে সবসময় জড়িয়ে ধরে নারীকে। অগণিত আশঙ্কায় তাই নারী বারে বারে ছুটে যায় নানা দেব-দেবীর কাছে। বাঙ্গলার নারীর জীবনঘনিষ্ঠ। ব্রতের কামনা ঐহিক। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কামনাই বেশিরভাগ ব্রতের লক্ষ্য।'

বারো মাসে তেরো পার্বণ নয়, বাঙ্গলার নারী জীবনে ব্রত পালনের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি ব্রতই কামনামূলক। প্রতিটির ভিত্তি হলো সংযম ও নিষ্ঠা। অনাহার, একাহার, বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তু গ্রহণ বা বর্জন এবং নানা বিধি নিষেধের মালায় গাঁথা বঙ্গনারীর নানা ব্রত। নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করেও পরিবার এবং সকলের মঙ্গল কামনার শান্তিমন্ত্রে প্রতিটি ব্রত অভিসিঞ্চিত, আর সে কারণেই বিশেষ করে বঙ্গ নারীর জীবনে ব্রতের অতুলনীয় অধিষ্ঠান রয়েছে।

এমনই এক কল্যাণ ব্রতের নাম বিপত্তারিণী। দেবী দুর্গার ১০৮টি রূপ বা অবতারের অন্যতম এই বিপত্তারিণী দুর্গা বা চণ্ডী। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া থেকে দশমীর মধ্যে যে কোনো মঙ্গল অথবা শনিবারে পালন করা হয় এই ব্রত। জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয় সন্তানসন্ততির কল্যাণের জন্য। আর আষাঢ়ে বিপত্তারিণী ব্রতের কামনায় নেই কোনো গণ্ডি। এই ব্রত পরিবারের সকলের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্যও পালন করেন বঙ্গনারী। সব বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করার কামনাতেই হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া এই ব্রতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুর্গারই এক রূপ : শ্রেণী বিচারে বিপত্তারিণী ব্রত শাস্ত্রীয় না লৌকিক, সে সম্পর্কে এক কথায় কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। শাস্ত্রীয় ব্রতের মতো পূজা এ ব্রতের অন্যতম একটা দিক। সেক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এই ব্রত পালনের অন্যান্য আচার, অনুষ্ঠান, সংযম পালন, ব্রতকথা শ্রবণ এবং আরও বেশ কিছু বিষয় আবার সম্পূর্ণভাবেই লৌকিক ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পৌরাণিক পূজার মতোই হয় দেবী বিপত্তারিণীর পূজা। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রেই হয় এই পূজা। অথচ শাস্ত্রগ্রন্থে এই পূজা করা বা ব্রত পালনের কোনোও নির্দেশই খুঁজে পান না পণ্ডিতরা। দেবী বিপত্তারিণী পূজার সবকিছুই যেন আবদ্ধ হয়েছে পঞ্জিকার পাতায়। পূজার এই পর্বটুকু বাদ দিলে এর বাকি সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেই রয়েছে লৌকিক ব্রতের অপূর্ব সাদৃশ্য। এই ব্রত যেভাবে সধবা নারীরা পালন করেন, তার সঙ্গে লৌকিক জীবন কথায় যেন জড়িয়ে রয়েছে অতি ঘনিষ্ঠভাবে।

ব্রত পালনের আগের দিন অথবা সেই দিনে ব্রতী নারীরা নিরামিষ খাবার খান। এটাকে বলা হয় সংযম। ব্রতের দিন পূজায় দিতে হয় তেরো রকম ফল, তেরোটি পান, তেরোটি সুপুরি। পূজার জন্য দিতে হয় তেরো রকম ফুল। পূজার অবশ্য অঙ্গ তেরো গাছা লাল সুতোর সঙ্গে তেরো গাছা দূর্বাঘাস দিয়ে তেরোটি গিঁট বেঁধে তৈরি বিশেষ ডুরি বা তাগা। পূজার শেষে এই ডুরি মেয়েদের বাঁ এবং ছেলেদের ডান হাতে

এই ধর্মসাধনা প্রায়শই কোনো পারলৌকিক সুখ-আনন্দ-তৃপ্তির কামনায় নয়, তার প্রায় ধর্মাচরণেই প্রধান হয়ে ওঠে পার্থিব কামনা। আর সে কারণেই বৈদিক বা পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা অর্চনার চেয়েও নারী প্রায় সারাটা বছর ধরেই পালন করে নানা বার-ব্রত। বস্তুত, ব্রত পালনে নারী যতটা আন্তরিক ও আগ্রহী, পুরুষ কদাচিৎই তেমন পথের পথিক। ব্রত পালন পুরোটাই যেন নারীর একার পালনীয় এবং আচরণীয় ধর্ম।

দেবীকেন্দ্রিক ব্রতই বেশি : বাঙ্গলায় যত সব ব্রত আছে তার বেশিরভাগই দেবীকেন্দ্রিক। নারীই নারীর মানসিক অবস্থা বুঝবে ভালো এবং সব বিপদ দূর করার জন্য এগিয়ে আসবে এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত বাঙ্গলায় প্রধান্য পেয়ে আসছে দেবীকেন্দ্রিক ব্রতগুলি। বাঙ্গলার নানা ব্রত বিশ্লেষণ করে তাই বিবুধজনের মন্তব্য, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রতের দেব-দেবী বেদ-পুরাণ বহির্ভূত। সাভিপ্রায় অভিচারে ব্রত

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

বেঁধে দেওয়া হয়। দৃঢ় বিশ্বাস, এই ডুরি হাতে বাঁধা থাকলে দেবী বিপত্তারিণীর কৃপায় উদ্ধার পাওয়া যাবে সবরকম বিপদ থেকে।

পূজা হয় আমের পল্লবের ওপর ডাব, কলা বা কোনো ফলে সাজানো ঘটে। ব্রত পালন করতে হয় অন্তত তিনবছর। ব্রতের দিন চালের কোনো কিছু যেমন ভাত, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া চলবে না। মহিলাদের অবশ্যই পরতে হয় আলতা সিঁদুর। দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করতে হয় দুটি নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের তেরোটি ফলের মধ্যে অবশ্যই একটি হবে আনারস। আনারস ন'টি টুকরো করে এক এক নৈবেদ্যে দিতে হয়। দুটি নৈবেদ্যের একটি দেওয়া হয় ব্রাহ্মণকে, অন্যটি প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয়।

পুরাণ কথায় বিপত্তারিণী : বলা হয়, যিনি দুর্গা তিনিই বিপত্তারিণী। পুরাণে তিনি দেবী কৌশিকী। আবার তিনিই জয়দুর্গা।

পুরাণকথা, শিবজায়া পার্বতীর দেহকোষ থেকে উৎপত্তি হয় দেবীর— তাই তিনি কৌশিকী। অন্যমতে তিনিই হলেন দেবী সংকটনাশিনী।

বিপত্তারিণী দেবীর পূজার শুরু সম্পর্কে পুরাণে আছে, অসুর শুম্ভ নিশুম্ভর কাছে পরাজিত দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে দেবী মহামায়ার স্তব করতে থাকেন। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন পার্বতী। স্তব শুনে কৌতূহলী পার্বতীর জিজ্ঞাসা, করে স্তব করছেন আপনারা? এই জিজ্ঞাসার মুহূর্তে পার্বতীর দেহ থেকে বেরিয়ে আসেন সমরূপা দেবী ভগবতী। বলেন, দেবতারা আমারই স্তব করছে। পরে দেবতাদের স্তবে তুষ্ট দেবী বধ করেন ওই দুই অসুরকে। তার আগে অবশ্য মোহাচ্ছন্ন ওই দুই অসুরকে তিনি দেন অদ্বৈত জ্ঞান। বলেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মাপরাম। পশ্যতা দুষ্ট মযেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।' যার অর্থ এই জগতে একা আমিই আছি। আমি ছাড়া আর কেই বা আছে? এই দেখ, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শক্তি আমারই বিভূতি। তাঁরা আমার মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দেবীকেই আরাধনা করা হয় বিপত্তারিণী রূপে। তিনি দেবতা-সহ সমস্ত জীবকেই রক্ষা করেন সব বিপদ থেকে। তাই তিনি বিপত্তারিণী। সমুদ্র মন্থনের সময় হলাহল পান করা নীলকণ্ঠ মহাদেবকে রক্ষা করেন তিনিই। কৃষ্ণের বিপদেও তিনি ত্রাণকারিণী।

অন্য এক পুরাণ কথা, মহেশ্বর একদিন পরিহাস করেই দেবী পার্বতীকে 'কালী' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাতেই রেগে গিয়ে শিবালয় ছেড়ে তপস্যা শুরু করে দেবী। সেই তপস্যার মধ্য দিয়েই নিজের 'কৃষ্ণবর্ণ' রূপ পরিত্যাগ করে তিনি হন গৌরী। আর তাঁর দেহ নির্গতা সেই দেবীই জয়দুর্গা বা কৌশিকী— বিপদতারিণী দুর্গা। এই জন্যই দেবীর এক ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে 'কালাভ্রাভাং' অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণা বা কালো মেয়ের মতো কৃষ্ণবর্ণা, কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসিনী, কপালে তাঁর চন্দ্রকলা, ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা দেবীর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল। তিনি সিংহবাহিনী। সমগ্র বিশ্বনিখিল তাঁর তেজে পরিপূর্ণ, দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ গণ পরিবৃতা সেই দেবীকেই স্মরণ করি।

পঞ্চদেবতার একজন এই বিপত্তারিণী দুর্গা। তিনি বহুরূপা। উত্তর ভারতে তাঁর পূজা হয় অষ্টাদশভুজা, দশভুজা বা চতুর্ভুজা রূপে। কোথাও তিনি স্বর্ণবর্ণা আবার কোথাও বা তিনি কৃষ্ণবর্ণা। বঙ্গদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চলে দেবীর পূজামন্ত্র— মাসি পুণ্যতমেবিপ্রমাধবে মাধব প্রিয়ে। নবম্যাং শুক্লপক্ষে চ বাসরে মঙ্গল শুভে। সর্পঋক্ষে চ মধ্যাহ্নে জানকী জনকালয়ে। আবির্ভূতা স্বয়ং দেবীযোগেষু শোভনেষুচ। নমঃ সর্বমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।

বিপত্তারিণী পূজার এই পর্ব অবশ্যই শাস্ত্রীয় আধারে অনুষ্ঠিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রে এ জাতীয় পূজার কোনো উল্লেখ না থাকার কারণে বিপত্তারিণীর ব্রতকথা থাকায় তাঁরা একে সরাসরি লৌকিক ব্রতকথারই পক্ষপাতী। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিপত্তারিণীর ব্রতকথা থাকায় লৌকিক ব্রত কথার ব্যাপারেও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। যদিও একথা সত্য, সংস্কৃতে ব্রতকথা রচিত হলেও বহু প্রচলিত ব্রতকথা অথবা পাঁচালিগুলি বাংলাতেই রচিত। তাছাড়া এই পূজায় মহিলারা যে ভূমিকা নেন, তার সঙ্গে লৌকিক ব্রতেরই মিল বেশি।

ব্রত কথা : বিপত্তারিণী ব্রতকথার কাহিনি বা তা বর্ণনার সূচনা সব জায়গায় একইরকম নয়। যেমন সংস্কৃতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে ব্রতকথা রয়েছে তার কথক হলেন স্বয়ং ঋষি মার্কণ্ডেয়। তিনি দেবী বিপত্তারিণীর যে কাহিনি শোনান, তার সার কথা হলো, দেবর্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে একদিন শিবালয়ে এসে মহেশ্বরের কাছে জানতে চান, কোন ব্রত পালন করলে গচ্ছিত ফল পাওয়া যায়? উত্তরে মহাদেব বলেন, 'বিপত্তারিণী দুর্গার ব্রতং কুর্বন্তি যা স্ত্রিয়ঃ'। —নারীরা যে বিপত্তারিণী ব্রত করেন তাতেই পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত ফল। নারদ আরও বিশদে শুনতে চাইলে মহাদেব সরব হন। শোনান এক কাহিনি। বলেন, এক সময় বিদর্ভদেশে ছিলেন এক সত্যপরাক্রম রাজা। তাঁর রানিও ছিলেন সমান গুণবতী। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলের প্রতিই ছিল তাঁর ভালোবাসা। সেই সূত্রেই এক চর্মকারের মেয়ে ছিল তাঁর সঙ্গী। মেয়েটিকে তিনি নানা মূল্যবান উপহার দিতেন। মেয়েটিও এনে দিত বনের নানা সুস্বাদু ফল। একদিন রানির ইচ্ছে হলো গোমাংস দেখার। চর্মকারের মেয়েকে তিনি বললেন গোমাংস আনতে। মেয়েটি প্রথমে রানিকে নানাভাবে বোঝায়। বলেন, সেটা বড়ো গর্হিত কর্ম হবে। কিন্তু রানির প্রবল ইচ্ছার কাছে হার মেনে মেয়েটি গোপনে খানিকটা গোমাংস এনে রানিকে দেয়। সেটা তিনি লুকিয়ে রাখেন ঘরে। কিন্তু এক রাজভৃত্য তা দেখতে পেয়ে রাজাকে খবরটা দেয়। ধর্মভীরু রাজা রানির কাছে জানতে চান সত্যটা। ভয়ে রানি বলেন, তাঁর ঘরে ফলমূল ছাড়া কিছু নেই। রাজা তাই দেখতে চান। বিপদে পড়ে রানি শরণ নেন বিপত্তারিণীর। মনে মনে প্রার্থনা করেন, 'বিপত্তারিণী দুর্গে ত্বং বিপন্নাং ত্রাহি মা শিবে'— মা না বুঝে অন্যায় করেছি। তুমি এখন রক্ষা করো।

রানির আর্তিতে করুণা হয় দেবীর। গোমাংস পরিণত হয় ফলে। রাজা তা দেখে সন্দেহমুক্ত হন। লজ্জিত হন নিজের সন্দেহের জন্য। দেবীর কৃপায় এভাবে বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে রানি দেবী বিপদত্তারিণীর ব্রত পালন করতে থাকেন এবং পূজাও করেন।

বিপত্তারিণীর পূজা ও ব্রতে লাল জবাফুল অবশ্যই দিতে হয়। বিপত্তারিণী পূজা ও ব্রত বহুকাল ধরেই বঙ্গদেশে প্রচলিত। অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও— মূল কথা ও পূজা বিধি একই।

বিপত্তারিণী মন্দির : যে কোনো মাতৃমন্দিরেই করা যায় এবং বিপত্তারিণীর পূজা হয়। তবে গড়িয়া, রাজপুর ও পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু কিছু জায়গায় দেবী বিপত্তারিণীর মন্দির আছে। রথযাত্রা থেকে উলটো রথের মধ্যে পড়া মঙ্গল বা শনিবারে সেখানে দেবী বিপত্তারিণীর বিশেষ পূজা হয়। বিপত্তারিণী পূজা ও ব্রতের একটি বিশেষত্ব পাশ্চাত্যে তেরো সংখ্যাটি অশুভ হলেও এখানে কিন্তু তেরো সংখ্যাটি শুভ। হিন্দুর ধর্মভাবনা যে অনেক সংস্কারমুক্ত এটি তার এক নিদর্শন। □

With Best Compliments
from

P. C. CHANDRA ®
JEWELLERS

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now

Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

ফজলুল হককে সমালোচনায় বিঁধতে ছাড়েননি শ্যামাপ্রসাদ

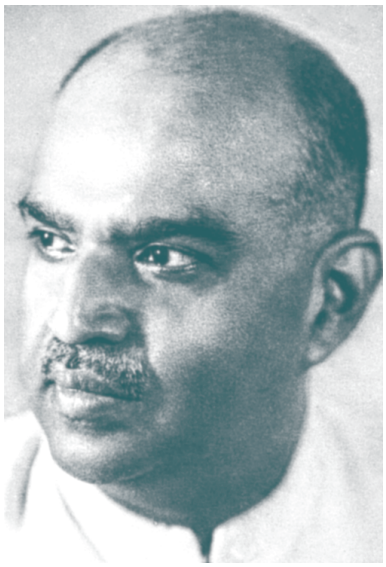

বিমল শঙ্কর নন্দ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙ্গলার রাজনীতি, বিশেষত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আলোচনা করলে যে দুজনের নাম সবার আগে আসবে তাঁরা হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আবুল কাশেম ফজলুল হক। তাঁদের কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাঙ্গলার রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল, কখনো কখনো তার গতিপ্রকৃতিও

ফজলুল হক (বাঁ দিকে) জিন্নার সঙ্গে।

বদলে দিয়েছিল। এই দুজনের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। আজ প্রায় একশো বছর পরে বাঙ্গলার রাজনীতির এই দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক একটি আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দুজনের পারিবারিক ঐতিহ্য, বেড়ে ওঠা অনেকটাই ভিন্ন পরিবেশে হয়েছিল। রাজনৈতিক সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও মিলের তুলনায় অমিলই বেশি। শ্যামাপ্রসাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আপোশহীনতা ফজলুল হকের মধ্যে একেবারে ছিল না। তবু রাজনীতির বিচিত্র গতিতে দুজনে কাছাকাছি এসেছিলেন। কিছুদিন একসঙ্গে পথও চলেছিলেন নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেই।

ফ ঃ ৫

শ্যামাপ্রসাদের জন্ম বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে, ৬ জুলাই ১৯০১ সালে। ঊনবিংশ শতক থেকে বাঙ্গলায় নবজাগরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার প্রভাব পড়ে বাঙ্গলার সমাজ এবং রাজনীতিতে, গড়ে ওঠে এক জাগ্রত মনীষা যা পুরোনোর বাধা সরিয়ে নতুনকে আহ্বান করে আনে। পুরোনো জড় সমাজ সংস্কারের স্পর্শে গতিশীল হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গলার এই জাগ্রত মনীষাকে বিংশ শতাব্দীতে বহন করে এনেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কলকাতার এমন একটি পরিবারে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম যা বাঙ্গলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একটি জাতি কিংবা জনগোষ্ঠীকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে উন্নত একটি জাতি কিংবা জনগোষ্ঠীকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে উন্নত এবং আধুনিক শিক্ষা, সেটা বুঝেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষাবিস্তারের এই ধারা বহন করে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিন্তু কখনো 'স্বাভিমান' এবং 'স্বাধিকার' বিসর্জন দেননি। স্বাধিকারের প্রশ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের শর্তাধীন আর্থিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে। তাঁর কাছে স্বাধিকারই ছিল প্রথম এবং শেষ কথা। শ্যামাপ্রসাদের সততা চারিত্রিক দৃঢ়তা, উদারবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে। শ্যামাপ্রসাদ নবজাগরণের ফলে অর্জিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য এবং তাঁর নিজস্ব পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, পার্লামেন্টেরিয়ান। রাষ্ট্রনায়ক, মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি একজন বাস্তববাদী কিন্তু আপোশহীন রাজনীতিবিদ। তাঁর ব্যক্তিত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা। ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে কখনো নীতির সঙ্গে তিনি আপোশ করেননি। ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সামান্য সমঝোতা করলেই দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে আরও শক্তি নিয়ে অধিষ্ঠান করতে পারতেন। অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিলে ভারতের ঐক্য এবং সংহতি বিপর্যস্ত হবে। তাই 'এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান' চলতে পারে না। এর প্রতিবাদে সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে ১৯৫৩ সালের মে মাসে জম্মু-কাশ্মীর অভিযান করেন এবং ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে ভারতের ঐক্য রক্ষার্থে কাশ্মীরেই আত্মবলিদান দিয়েছেন।

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide

শ্যামাপ্রসাদের মতো আপোশহীন, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের তুলনা ফজলুল হকের সঙ্গে করা অত্যন্ত কঠিন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'হক সাহেবের মধ্যে একটা অশান্ত অস্থিরতা নীতি নির্ধারণের শৈথিল্য, দরাজ চরিত্রের মানুষ হয়েও কৌশলীদের হাতে পড়ে ভুল পথে যাবার প্রবণতা ছিল...'। শ্যামাপ্রসাদের চেয়ে ২৮ বছরের বড়ো ফজলুল হক জন্মেছিলেন ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর। আধুনিক পশ্চিম শিক্ষা ফজলুল হকও গ্রহণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্স-সহ বিএ, এরপর এমএ এবং ল' পাশ করা ফজলুল হকও ছিলেন যথেষ্টই উচ্চশিক্ষিত। প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করেন, পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। সেখানেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ততা এবং ক্ষমতার লোভ তাঁকে সারা জীবন পথের বিভিন্ন বাঁকে নিয়ে গেছে। কখনো ক্ষমতার উচ্চ শিখরে, কখনো খাদের কিনারায়। ১৯০৫ সালেই ঢাকায় মুসলমান রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন ফজলুল হক এবং বোম্বাই গিয়ে মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ। ফজলুল হক অনেকদিন কংগ্রেস ও লিগের সদস্যপদ রেখেছিলেন একসঙ্গে। অবশ্য ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত কংগ্রেস ও লিগের দূরত্ব ছিল অল্প। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে 'হিন্দু মুসলমান চুক্তি' গৃহীত হয় এবং বিপিনচন্দ্র পাল লিগের সভায় ভাষণ দেন। ফজলুল হকও তখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক পরিচিত নাম। ১৯১৮ সালে যখন কংগ্রেস ও লিগ উভয়েরই অধিবেশন হয় এলাহাবাদে তখন ফজলুল হক একই সঙ্গে লিগের সভাপতি এবং নিখিল ভারতের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, '১৯১৫ সাল থেকে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় সংস্থাকে কাছাকাছি এনে প্রগতিশীল রাজনীতির আসরে হক সাহেবের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।' বরিশালের গ্রামে জন্মানো ফজলুল হক ব্রিটিশ শাসনে কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাধারণ কৃষক তাদের জমি হারায়। জমির নতুন মালিক হয় জমিদার শ্রেণী। শুরু হয় জমিদার ও কৃষক-প্রজা সম্প্রদায়ের মধ্যে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। ১৮৫৯ সালে বাঙ্গলার প্রজাস্বত্ব আইন চালু হলেও এতে খাজনার হার স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এই আইনের সাহায্যে কৃষক প্রজারা জমিতে তাদের দখলি স্বত্ব কায়েম করতে পারেনি। জমিদারদের খাজনা এবং অতিরিক্ত করের চাপে বাঙ্গলার কৃষক প্রজারা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কিছু কৃষক জমিতে স্থায়ী স্বত্ব লাভ করলেও অনেকেই এই আইনের আওতার বাইরে থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই আইনে লাভ হয়েছিল মধ্যবিত্ত জোতদার শ্রেণীর। গরিব কৃষকদের দুরবস্থা নিজের চোখে দেখেছিলেন ফজলুল হক। ১৯১৪ সালে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় প্রজা আন্দোলন। সরকারি চাকরি ছেড়ে ফলজুল হক প্রজা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষক-প্রজারা কিছু অধিকার ফিরে পায়। এই সময় ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন বাঙ্গলার কৃষক-প্রজা শ্রেণীর জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। ১৯১৯ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টি যা অনতি বিলম্বে বাঙ্গলার গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৩৭ সালের বাঙ্গলার বিধানসভা নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। জিন্নাপন্থীরা ফজলুল হককে হারাতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ফজলুল হক মুসলিম লিগকেই বাঙ্গলার মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের দলের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। এমনকী বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে লিগের শীর্ষ নেতা নাজিমুদ্দিন ফজলুল হকের কাছে পরাজিত হন।

অথচ বাঙ্গলায় প্রগতিশীল রাজনীতিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠা করার যে সুযোগ ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক বিধানসভা নির্বাচনে উপস্থিত হয়েছিল ফজলুল হকের ক্ষমতার প্রতি লোভ তাকে নষ্ট করে দেয়। বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে সেই লিগের সঙ্গেই মোর্চা করে সরকার গঠন করলেন ফজলুল হক। কারণ নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট সরকার গঠন ছিল অনিবার্য। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে সম্মত হননি। ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট সরকার গঠন করেন। ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকার সুযোগ পেয়ে মুসলিম লিগ সরকার গঠন করে। বাঙ্গলায় তার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি করতে থাকে। ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রাদেশিক সরকারের প্রধানকেও প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) হলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল লিগের হাতে। ফলে মুসলিম লিগ ফজলুল হককে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এমনকী ফজলুল হকের দলের টিকিটে নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য লিগের দিকে চলে যান। অর্থাৎ একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবিমৃশ্যকারিতা এবং দূরদৃষ্টির অভাব অন্যদিকে ফজলুল হকের অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রতি লোভ বাঙ্গলার রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতার অতলে নিয়ে যায়। ফজলুল হক তখন লিগের হাতে ক্রীড়নকমাত্র। ফজলুল হকের উপর জিন্নার নিয়ন্ত্রণ এতখানি ছিল যে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লিগের প্রকাশ্য অধিবেশনে

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

With Best Compliments from-

B.J.P. Ex-vice President

PIYUSH KANODIA

Kolkata North Subarban District

THE CO-WORKING EXPERIENCE

BECOME A MEMBER OF CORNER DESK

Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.

At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk

Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square

Don't be afraid to give up the good to go for the great.

FOR DETAILS CONTACT : 9831036310 I 9836054628 I 8334051100

সভাপতি জিন্না ফজলুল হককে দিয়ে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করান। ২৪ মার্চ এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কিন্তু ১৯৪১ সালের জুলাই মাস থেকেই ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নার মতবিরোধ শুরু হয়। এরপর ফজলুল হক দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা শুরু করেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফজলুল হকের এই ধরনের মনোভাব দেখেই সম্ভবত আমেরিকার ঐতিহাসিক লিওনার্ড গর্ডন তাঁর 'ব্রাদার্স এগইন্স্ট দ্য রাজ' গ্রন্থে বলেছেন যে, 'ফজলুল হক ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত, চপলমতি; রাতে যা ভাবেন, সকালে তার বিপরীত করেন'।

ফজলুল হকের এই চরিত্র জানতেন শ্যামাপ্রসাদ। ফজলুল হক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র আইনজীবী, তাই তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলায় সরকার গঠন বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'ফজলুল হক ক্ষমতার জন্য প্রায় মরে যাচ্ছিলেন। তিনি লিগের পাল্লায় পড়তে চাননি, তিনি চাইছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গড়তে, যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি নিজে'। কিন্তু কংগ্রেসের নির্বুদ্ধিতায় তা হয়নি। গঠিত হয় হক-লিগ মন্ত্রীসভা। ক্ষমতা হাতে পেয়ে লিগ ফজলুল হককে শিখণ্ডী খাড়া করে বাঙ্গলার সমাজ এবং রাজনীতির সর্বত্র দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা, প্রশাসন সর্বত্রই ইসলামীকরণ শুরু হয়ে যায়। এই সময় বিধানসভার সদস্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে। ফজলুল হকও তাঁর সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাননি। ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর লিগ সদস্যরা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করায় হক-লিগ সরকারের পতন ঘটে। ৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্বপদ গ্রহণ করে কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেসের একাংশ এবং হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সহযোগিতায় পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১২ ডিসেম্বর ফজলুল হক- শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণ করে। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এই সরকারের অর্থমন্ত্রী। এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে এই মন্ত্রীসভাকে কাজ করতে হয়।

একদিকে বাঙ্গলার গভর্নর স্যার জন হাবার্টি এবং অন্যান্য ইংরেজ অফিসারের অসহযোগিতা, অন্য দিকে মুসলিম লিগের মারমুখী মনোভাবের মোকাবিলা করতে হয়েছিল এই মন্ত্রীসভাকে। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকের পাশে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ আগের লিগ মন্ত্রীসভার সদস্যদের দুর্নীতিও উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। এ কাজে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করেন ফজলুল হক। অবশ্য ১৯৪৩ সালে ২৯ মার্চ গভর্নর স্যার জন হাবার্টি ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করেন। পতন হয় মন্ত্রীসভার। শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য এর আগেই পদত্যাগ করেছিলেন।

১৯৪৫-৪৬ সাল থেকেই শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন পাকিস্তানের সৃষ্টি রুখে দেওয়া অসম্ভব। তখন থেকেই বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড তৈরির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গ বিধানসভার হিন্দু সদস্যরা বিপুলভাবে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পক্ষে ভোট দেন। ফজলুল হক বঙ্গ ভাগ মানতে পারেননি। কিন্তু বঙ্গবিভাজন আটকানোর কোনো উপায়ও ছিল না। ১৯৩৭ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভে বিপজ্জনক মুসলিম লিগকে বাঙ্গলার ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকতে দিয়ে যে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন ফজলুল হক, তার রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছিল বাঙ্গলাকে। বাঙ্গলা ভাগ ছিল কংগ্রেসের এবং ফজলুল হকের ভুল রাজনীতির করুণ পরিণতি। কিন্তু ফজলুল হক যেখানে ব্যর্থ, শ্যামাপ্রসাদ সেখানে সফল। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা হয়ে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু বাঙ্গালিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই বাঙ্গলার রাজনীতির আকাশে শ্যামাপ্রসাদ সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

(লেখক একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক)

শিল্পী - শীর্ষ আচার্য।

তিমির বমি কোটি টাকা

'বমি' কথাটা শুনলেই কেমন আমাদের গা রি রি করে ওঠে তাই না! বমি জিনিসটাই এমন যে তা দেখলে বা শুনলেই আমাদের ঘেন্না হয়। কেউ কেউ ওয়াক তোলে। কখনো কখনো খাবার আমাদের পরিপাক তন্ত্রে হজম হয় না। আমাদের গা গুলোতে থাকে। বদ হজমের দরুন সেই অপাচ্য খাবারই বমি হয়ে আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের ওই অপাচ্য খাদ্যবস্তু বা বমি খুব মূল্যবান। যেমন মধু। মানুষ থেকে শুরু করে ভালুক এবং আরও অনেক প্রাণীর মধু খুব প্রিয়। আমরা জানি যে মৌমাছি ফুলের থেকে রেণু থেকে রস সংগ্রহ করে তাদের পাকস্থলীতে রাখে। তারপর পরিপাক করে মৌচাকের কুঠুরিতে বমি করে দেয়। সেইটাই মধু। সেই মধুর অনেক গুণ।

তেমনই স্পার্ম নামে একপ্রকার তিমি আছে, যাদের বমির দাম প্রায় কোটি টাকা। শুনে অবাক লাগছে তো! আসলে স্পার্ম তিমিরা সারাদিন স্কুইড (অক্টোপাস জাতীয় প্রাণী) খেয়ে থাকে। এগুলো পাকস্থলীতে গিয়ে জমে। সেখানে জটিল শারীরিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় অ্যাম্বারগ্রিস নামে একরকম পদার্থ। এটি তিমির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে জলের মধ্যে মোমের মতো জমে যায়। এবং জলে ভাসতে থাকে। দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ক্রমে সাগরের তীরে এসে জমা হয়। দামি সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় অ্যাম্বারগ্রিস। কস্তুরীর মতো সুগন্ধি তৈরিতে এর জুড়ি মেলা ভার। শুধু তাই নয়, ওষুধ এবং খাবারের হরেক রকম সুস্বাদু পদ রান্না করতে লাগে অ্যাম্বারগ্রিস। আন্তর্জাতিক বাজারে এক কেজি অ্যাম্বারগ্রিসের দাম ১ কোটি টাকা। তাই একে বলা হয় ফ্লোটিং গোল্ড বা ভাসমান সোনা। মূলত গ্রিনল্যান্ড, ফকল্যান্ড, সাউথ জর্জিয়াসহ আন্টার্কটিকা ও আর্কটিকের বিভিন্ন এলাকায় স্পার্ম তিমি পাওয়া যায়। ভারতের মুম্বই সমুদ্র উপকূলে স্পার্ম তিমির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের বই 'মেটেরিয়া মেডিকা' ও ভারতের বিভিন্ন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে অ্যাম্বারগ্রিস দিয়ে চিকিৎসার উল্লেখ আছে। এদেশে একসময় শারীরিক দুর্বলতা, টাইফয়েড, মৃগী, জটিল স্নায়ু রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ঔষধি গাছগাছড়ার সঙ্গে অ্যাম্বারগ্রিস ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

@নিচি

ভারতের বিপ্লবী

যতীশ গুহ

বিপ্লবী যতীশ গুহ ১৯০৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় শিক্ষালাভের পর তিনি কলকাতায় এসে ১৯৩০ সালে এমএ এবং ১৯৩১ সালে বিএল পাশ করেন। বিএল পাশ করার পর ছোটো আদালতে ওকালতি শুরু করেন। বিপ্লবীদলের সদস্য রূপে বিভিন্ন গুপ্ত কাজে সক্রিয় ছিলেন। পরে ফরোয়ার্ড দলের সঙ্গে যুক্ত হন। এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লির লালকেল্লায় বন্দি রাখে। ১৯৪৬ সালে বন্দিদশায় নির্মম অত্যাচারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- মহাবলীপুরমের রথমন্দির তৈরি হয়েছিল পল্লবদের দ্বারা।
- ঈশ্বরের নিজের দেশ বলা হয় কেরালা রাজ্যকে।
- মধ্যপ্রদেশের জনপ্রিয় লোকনৃত্যের নাম মাটকি।
- বিখ্যাত নবকলেবর উৎসব পালিত হয় ওড়িশায়।
- মেঘালয়ের লোকনৃত্যের নাম লাহো।
- মণিপুরে মার্শাল আর্টের নাম থাং তা।
- মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা গুহা শিবের নামে উৎসর্গীকৃত।
- হেমিস উৎসব পালিত হয় লাদাখে।

ভালো কথা

চামচিকা

চামচিকা আমার খুব ভয় করে। মামার বাড়িতে খুব চামচিকা। তাই আমি মামার বাড়ি খুব একটা যাই না। অনেক বছর পর এবার পরীক্ষার পর মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা দিদার কাছে বসে গল্প শুনছিলাম, তখনই দুটো চামচিকা ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক উড়তে লাগল। আমি তো ভয়ে সিটিয়ে গেছি। দিদি বলল, চামচিকাকে আবার ভয় কীসের! ওগুলো ঘরে ঢুকেছে মানে মশা খাচ্ছে। একটা চামচিকা একরাতে তিন হাজার মশা খেয়ে ফেলে। ক্ষতিকর পোকামাকড়ও খেয়ে নেয়। ওরা তুচ্ছ প্রাণী নয়। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। আমি বললাম, ওরা ঘরে ঢুকলে নাকি অমঙ্গল হয়? দিদা বলল , একদম বাজে কথা। মশা খেয়ে পেট ভরে গেলেই চলে যাবে।

যুথিকা সেন, অষ্টমশ্রেণী, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বেশ ভালো লাগে

আয়ুষ্মান মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণী, চুঁচুড়া, হুগলী।

বেশ ভালো লাগে চারিদিক দেখতে
চোখ-কান খোলা রেখে রাস্তায় হাঁটতে,
গ্রীষ্মের গরমে রাস্তাটা শুনশান
হাঁস নামে পুকুরে সাঁতার কাটতে।
সাদা ফলে গাছটিতে ভরে আছে জামরুল
তারি চারপাশে ঘোরে বড়ো বড়ো ভীমরুল।
বেশ ভালো লাগে চারিদিক দেখতে
কলস কাঁখে বধু যায় জল আনতে।
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জলে ভেজা গায়
থই থই করে ওঠে কলের তলা,
চারিদিক শুনশান দুপুরের রোদ
হাঁক দিয়ে ডেকে যায় ফেরিওয়ালা।
ঘুমে চোখ বুজে আসে , ঝিম ধরে গায়ে
অলস দুপুরবেলা চলে পায়ে পায়ে।।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

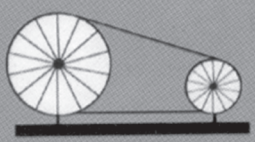

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

শ্যামাপ্রসাদের বড়ো হয়ে ওঠা এবং পারিবারিক সংস্কার

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দী। কলকাতার এক অন্যতম বিখ্যাত পরিবারে এক বাঘের সন্তান ধীরে ধীরে হয়ে উঠছেন এক সিংহ। 'বাঙ্গলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখার্জির সুযোগ্য পুত্র 'ভারতকেশরী' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পিছনে পরিবার থেকে উত্থিত প্রেরণা এবং পারিবারিক সংস্কার এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্যামাপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

১৯০১ সালের ৬ জুলাই এই সিংহের জন্ম। তিনিই পরবর্তীকালে হবেন বাঙ্গালি হিন্দুর পরিত্রাতা। সনাতনী সংস্কৃতির জয়ের রথ ছুটিয়ে বঙ্গমাতাকে আরব-সংস্কৃতি থেকে হাইজ্যাক করে এনে ভারতমাতার সঙ্গে অবলীলায় মিশিয়ে দেবেন। এমন দুঃসাহসিক কাজ 'সিংহ' ছাড়া কে করবেন!

শ্যামাপ্রসাদের পিতামহ ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নাম। বাইরে যতটা কঠোর, 'ঝুনো নারকেল'-এর মতো, ভেতরে ভেতরে কিন্তু ততটাই কোমল, স্বচ্ছ, হৃদয়বান; এক অনাড়ম্বর জীবন; সনাতনী সংস্কৃতির ঋত-সত্যকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পথ চলা, হিন্দু জীবনচর্যা ও মানসচর্চায় ব্রতী মানুষ। রামায়ণ পাঠ ও চর্চা করেন তিনি। পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। সে পাণ্ডুলিপি পাওয়াও যায় তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সংগ্রহে। মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু তথ্য জনপ্রিয় করে বাংলা ভাষায় লেখার অভ্যাসও করেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করেন। বইগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়ও হয়। চারিদিকের তৎকালীন সাহেবিয়ানার মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার যদি দৈনন্দিন জীবনাচরণার বই লেখেন, কীভাবে সন্তানের যোগ্য জননী হয়ে উঠবেন, কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করবেন, সন্তানের দৈনিক যত্ন কীভাবে নেবেন, তাহলে তার তন্নিষ্ঠ-পাঠ সমাজকেও অভূতপূর্ব বার্তা দেবে। চিকিৎসক হিসেবে তা বিস্তারিত আলোচনা করতে দেখা গেছে তাঁকে। সেই বার্তা তাঁর পরিবারের মধ্যেও সংবাহিত হলো। তাঁরই সুসন্তান আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন দেশীয় ভাষায় স্নাতকোত্তর পঠনপাঠানের ব্যবস্থা করলেন। পিতার নির্দেশে শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া

মা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ।

সত্ত্বেও এম.এ-তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়লেন এবং সর্বোচ্চ স্থান দখল করলেন। আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। অর্থাৎ একাদিক্রমে তিনটি প্রজন্ম বাঙ্গলার জন্য, বাংলা ভাষার জন্য সমানে কাজ করে চলেছিলেন।

কলকাতার ভবানীপুরে নর্থ রসা রোডে পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি কিনে এসেছিলেন ১৮৭৩ সালে। এই বাড়ির ঠিকানাই বর্তমানে ৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড। এই বাড়িতেই শ্যামাপ্রসাদের জন্ম। যদিও তাঁরা আদিতে কলকাতার অধিবাসী ছিলেন না। গঙ্গাপ্রসাদের বাবা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের পৈতৃক আবাস বাগনাপাড়া ছেড়ে পাকাপাকি তাঁর মাতুলালয় হুগলীর জিরাটে চলে আসেন।

শ্যামাপ্রসাদের প্রপিতামহী ব্রহ্মময়ী দেবী, পিতামহী জগৎতারিণী দেবী এবং মা যোগমায়া দেবী। হিন্দু ঘরের ধর্মপ্রাণা রমণী বলতে যা বোঝায় তেমনই মাতৃশক্তি তাঁরা; চিরদিনের 'হিন্দুয়ানী' তাঁদের জীবনাচরণে। মুখার্জি বাড়িতে পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, নানারকম ব্রতপালন হয়। এমনকী ভবানীপুরের বাড়িতে গোপালনের ব্যবস্থাও আছে, দৈনিক দুধের জোগান আসে সেখান থেকে। পেঁয়াজ-রসুন বাড়িতে মোটেই ঢোকে না, কালীঘাটের প্রসাদী মাংস ব্যতিরেকে বাইরের আমিষ খাবারও আসে না। এমনই মা ও ঠাকুমাকে ছোটো থেকে নিজের মতো

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

করে পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। জানা যায়, তাঁর প্রপিতামহী ব্রহ্মময়ী দেবী তীর্থ করতে পদব্রজে পুরীতে গিয়েছিলেন। অবশ্য পুরীতেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। শ্যামাপ্রসাদের পরিবারের তীর্থপ্রীতির আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর তিন বছর বয়সে পিতা আশুতোষ সপরিবারে কাশীতে গিয়েছিলেন এবং একটি বড়ো বাড়ির হলঘরে সবাই মিলে ছিলেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে কাশীতেই স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে হিন্দুত্বের জন্য শ্যামাপ্রসাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। এদিকে শ্যামাপ্রসাদের মাতামহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যও ছিলেন অতি সাত্ত্বিক ও ধর্মপরায়ণ স্বভাবের পণ্ডিত ব্যক্তি।

শ্যামাপ্রসাদের ডাক নাম 'বেণী'। বেণী-রা চার ভাই— শ্যামাপ্রসাদ মেজো; বড়দা রমাপ্রসাদ; সেজোভাই উমাপ্রসাদ; ছোটো বামাপ্রসাদ; বড়দি কমলাদেবী। অন্য বোনেরা হলেন অমলাদেবী ও রমলাদেবী। বেণীর বড়দির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যদিও বঙ্গিমচন্দ্র এক দশক আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। পিতা আশুতোষ জামাইকে পুত্রস্নেহে যত্ন করতেন। কিন্তু এই জামাই বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই টাইফয়েড রোগে অকাল-প্রয়াত হন।

'বেণী' নামটি শ্যামাপ্রসাদের পছন্দ ছিল না। কারণ স্কুলে গিয়ে শিশুপাঠ্য 'বেণী'র গল্পে পড়লেন— 'বেণী বড়ো দুরন্ত ছেলে।' স্কুলের বন্ধুরা তাই খেপাতো। এই সেই দামাল-দুরন্ত বাচ্চা, যার নাম বইয়ের পাতায় আছে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! বাড়িতে বাবাকে চেপে ধরলেন, নাম তাঁর বদলাতেই হবে, কোনো কথা শুনবে না। অবশেষে সমস্ত ভাইয়ের 'প্রসাদ' সংযোজক-নাম রাখা ঠিক হলো। বেণীর তাই নতুন নাম হলো 'শ্যামাপ্রসাদ'।

শ্যামাপ্রসাদের পরিবারে মাতৃভক্তি এক অনবদ্য সৌকর্য। আশুতোষ মুখার্জি ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি হয়ে বিলেত যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও মায়ের অনুমতি না পাওয়ায় সমুদ্রযাত্রা করতে পারেননি। পিতার আদেশও পরিবারে শিরোধার্য ছিল। পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র ব্রিটিশের চাকরি নেবে না। যদি নিতেই হয়, একমাত্র হাইকোর্টের জজ ছাড়া আর কোনো চাকরি নয়। আশুতোষ কথা রেখেছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁর কাছে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব আসে। যেহেতু পদাধিকারবলে এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়া সম্ভব, তাই তিনি পদটি গ্রহণ করেছিলেন। যদিও পূর্বের ওকালতি বৃত্তিতে তাঁর আয় বর্তমানের আয় থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। এই পদ গ্রহণের সময় আশুতোষের মাতৃদেবী জীবিত ছিলেন। তাঁর

স্ত্রী সুধা দেবীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ (১৯২২)।

সম্মতির জন্যও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় ও বোঝাতে হয়। এই রকম একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শ্যামাপ্রসাদও তাই এক খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালি হয়ে উঠেছিলেন, বাঙ্গলাকে দেশমাতৃকার মতো সমানভাবেই ভালোবেসেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মা-কে বিশেষভাবে কাছে চাইতেন, আদরের একটুও কমতি যেন না হয়! ১৯০৯ সালে তাঁর গুটি ও জলবসন্তের মতো মিশ্র রোগ হয়। তখন তাঁকে আলাদা করে অন্য সব ভাই-বোনদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। মা সেই সময় তাঁর কাছে থাকতেন। ১৯০৬ সালে একবার বাবা ও বড়দার সঙ্গে সিমলা যাওয়ার বায়না করেও, শেষে মায়ের কথা মনে করে শেষলগ্নে ইনজিনের বাঁশি বাজার সময়ে যাত্রা স্থগিত করে, পিতার অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর ব্যবহার্য সামগ্রী তখন আর আলাদা করে বার করা সম্ভব ছিল না। বাবা এবং দাদা গেলেন সিমলা, সঙ্গে তাঁর সামগ্রী গেল বেড়াতে। স্টেশন থেকে ফিরে এসে আদরের শ্যামা

শ্যামাপ্রসাদ একেবারে বাঁদিকে (বসে), উমাপ্রসাদ (দাঁড়িয়ে), রমাপ্রসাদ (ডানদিকে বসে) এবং মাঝখানে অমলা। (১৯০৫)

মায়ের কাছে মাথা গুঁজলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ।

আম খেতে খুব ভালোবাসতেন শ্যামাপ্রসাদ। যখনকার কথা বলছি, তখনও তিনি শিশু, স্কুলে যাওয়া শুরু হয়নি। বয়স প্রায় দুই বছর; উঠে দাঁড়াতে পারেন না, হাঁটতেও পারেন না, কোনোক্রমে বসতে পারেন, এক দু'টি কথা হয়তো বলতে পারেন। কিন্তু সেই বয়স থেকেই বেণী খেতে খুব ভালোবাসেন। নানান খাবারের মধ্যে আম পেলে তো কথাই নেই! গ্রীষ্মের মরশুমে তাকে রসালো-মিষ্টি পাকা নরম আম দেওয়া হতো। হাতে রগড়ে ভেতরের শাঁস চুষে খাওয়ার উপযুক্ত করে তিনি একটি ফুটো করে নিতেন।

১৯০৩ সালের আমের মরশুমের কথা। সেদিন একটা বড়োসড়ো আম বেণীর হতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিশাল বপু, তিনিও খেতে ভালোবাসেন। তবে দুই বছরের বাচ্চার হাতে এত বড়ো আম দেখে যোগমায়া দেবীকে একচোট বকে স্নান করতে চলে গেলেন। শিশু বাবার মুখের দিকে তাকায়, হয়তো মনে মনে ভাবে, তুমি আর আমার কী খবর রাখো! স্নান শেষ হলো, আশুতোষ বেণীর পাশ দিয়েই ঘরে ঢুকবেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, কোলের শিশু আমটি খাওয়া শেষ করেছে, আঁটিটিও চেটে সাদা করে দিয়েছে। এবার আঁটি-খোসা ছুঁড়ে ফেলে, বাবার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'ওই যাঃ!' আরেকটি পাকা আমের জন্য মায়ের কাছে হাত বাড়িয়েছে। বাবার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে যেন, আমি রোজ এবেলা- ওবেলা গোটা আম চুষে খাই; আজ আর নতুন কী!

১৯৪৫ সাল নাগাদ শ্যামাপ্রসাদ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথ ছাত্রদের কাছে গিয়েছিলেন। পুরোনো আশ্রম বাড়ির সামনে প্রাচীন আমগাছের তলায় শামিয়ানা খাটিয়ে কাঠের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। তখন আমের শেষ মরশুম, বর্ষা শুরু হয়েছে। আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের ফলপ্রসাদ ও আশ্রমের বাগানের সুস্বাদু আম কেটে তাঁকে পরিবেশন করা হয়। জানিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রয়াত আশ্রমিক বিধুভূষণ নন্দ।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি ভবানীপুরের কাঁসারিপাড়ায় অবস্থিত মিত্র ইনস্টিটিউটের শাখাস্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে বড়দাও তখন ভর্তি হয়েছেন। জেদ করেই প্রথম দিকে গেলেন স্কুলে। তবুও শ্রেণীকক্ষে তাঁকে সবসময় মনোযোগী থাকতেই দেখা যেত। সবসময় মেধার পরিচয় পেয়ে শিক্ষকমশাইরা খুশি হতেন। ১৯১৭ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তিনি এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করলেন। ১৯১৯ সালে তিনি আই.এ পাশ করেন এবং প্রথম স্থান লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক পান। ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষায় বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। এরপর তিনি ১৯২৪ সালে আইন কলেজ থেকে বি.এল পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। পেশা হিসেবে প্রথমে বেছে নিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি। এই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হলেন। এদিকে এম.এ পরীক্ষা চলতে চলতেই ১৯২২ সালে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী সুধাদেবীর সঙ্গে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো।

বয়সের অনুপাতে শ্যামাপ্রসাদ বেশ খানিকট বড়োসড়োই ছিলেন। ছির ভারী দেহ, চালচলনেও ভারিক্কি স্বভাব। সবার মধ্যে তাঁকে পৃথকভাবে চেনা যেতো বলেই তিনি অনন্য ছিলেন। বেশি বয়সিদের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব আর মেলামেশা। প্রজ্ঞায় ও মানসিকতায় এগিয়ে ছিলেন বলেই বড়ো ছেলেদের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য ভাবে মিশতে পারতেন। তবে পরিমিতিবোধ ছিল সকলের সঙ্গে আচরণে। কিন্তু গুরুগম্ভীর রসিকতাও ছাড়তেন না। কেউ অবাঞ্ছিত, অশোভন আচরণ করলে পালটা উত্তর দিতে ভুলতেন না। 'টিট ফর ট্যাট্' বলতে যা বোঝায়, উপযুক্ত জায়গায় যোগ্য জবাব দিতে দেখা গেছে সবসময়। তাঁর ভাই উমাপ্রসাদের স্মৃতিচারণায় কলেজ লাইফের একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সবে ভর্তি হয়েছেন। একদিন সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় করিডোরে পৌঁছাতেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন অপরিচিত ছাত্রের অভূতপূর্ব অভব্যতার সম্মুখীন হলেন। একজন কাছে এসে তাঁর স্থূল উদরে হাত বুলিয়ে সম্বোধন করতে লাগলেন, 'আরে ভাই কী খবর।' শ্যামাপ্রসাদও কালবিলম্ব না করে বিশাল মুষ্টিতে তার পিঠে অসম্ভব জোরে একটা কিল মেরে খাবলা দিয়ে পিঠের খানিক মাংসপেশি টেনে ধরে বললেন, 'এই তো! কদ্দিন পরে দেখা!' ঘটনার আকস্মিকতায় অপরিচিত ছাত্রটি যেই বলে উঠেছেন, 'ওঃ, আর একজনকে ভেবে ভুল করেছি, চিনতে পারিনি, ছাড়ুন ছাড়ুন।' শ্যামাপ্রসাদও সেই যাত্রায় তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'সত্যি! তাই তো? আমারও ভুল হয়েছে দেখছি। মনে করবেন না কিছু।' রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরে তিনি এই কৌশলেই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন। জওহরলাল নেহরু সংসদে ভয়ে তটস্থ থাকতেন, কখন না জানি শ্যামাপ্রসাদের ফিরতি অস্ত্রে তিনি নিজেই ঘায়েল হয়ে যান! শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাতপাঁচ ভেবেই তিনি সবসময় উত্তর দিতেন।

শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। মন্ত্রিত্ব, রাজনীতি, সেবাকাজ ইত্যাদি বাদ দিলেও স্রেফ কলকাতার মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রয়াত উপাচার্য হিসেবে অন্তত জন্মদিনে একটি হলেও মালা প্রাপ্য হয় তাঁর; হিন্দু বাঙ্গালির জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে, বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'কে পাকিস্তান থেকে কেটে এনে দিতে গিয়ে, এক দেশ/এক কানুন/এক প্রধান/এক নিশানের দাবিতে লড়তে গিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' পদবদ্য হয়ে শাসকের মালা হারিয়েছেন তিনি। তাতে অবশ্য তাঁর বিন্দুমাত্র সম্মান কমেনি, কমবেও না। যত দিন যাচ্ছে, বাঙ্গালি মানসে তিনি ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। আজকের দিনে অনেকানেক অমেরুদণ্ডী শিক্ষাবিদের বিপ্রতীপে তিনি এক প্রবল প্রতাপ পুরুষ সিংহ। তোতাপাখির মতো বুলি শেখানো শিক্ষাবিদেরা প্রতিষ্ঠানে যে কতখানি অপ্রাসঙ্গিক, তা শ্যামাপ্রসাদকে সামনে রেখে পরিমাপ করে বুঝতে পারি আমরা। এইসব অনন্য গুণাবলী রচিত হয়ে গিয়েছিল, শ্যামাপ্রসাদের বাল্যাবস্থা থেকেই।

ছাত্রাবস্থায় জেনেছিলাম, অনাথ ছাত্রদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদের বিশেষ স্নেহমমতা ছিল। আমি অকালে বাবাকে হারিয়ে কার্যত অনাথ হয়ে পড়েছিলাম, তাই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে আমার ঠাঁই হলো। সেখানে একটি অনাথ ছাত্রাবাসের নাম 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। সাধারণভাবে বিভিন্ন হোস্টেলের নাম 'ব্রহ্মানন্দ ধাম', 'শিবানন্দ ধাম' 'শিবানন্দ ধাম' যোগানন্দ ধাম' ইত্যাদি হতো জানতাম। কিন্তু তার মধ্যে 'অন্য জাতীয় শব্দ' 'হিন্দু মহাসভা ধাম' কীভাবে হয়ে গেল, তার যোগ্য জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন। মিশনের সবচাইতে প্রাচীন আশ্রমিক শ্রী বিধুভূষণ নন্দ আমার যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। জানলাম, রহড়া বালকাশ্রমে হিন্দুমহাসভার দানও আছে। ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩৭ জন বালক-নারায়ণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বালকাশ্রম। প্রথম কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৪৫ সালে পুণ্যানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্যামাপ্রসাদ খড়দায় এসেছিলেন কেবল হিন্দু মহাসভার নেতা হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেও। তিনি এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে, ত নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রহড়ায় পরবর্তীকালে অনাথ ছেলেদের কর্মসংস্থানমুখী কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনা সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদেরই মানস-ভাবনা। এখানকার ছেলেরা খেলাধুলা, সংগীত, অভিনয়— সব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এমনটাই চেয়েছিলেন, জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী বিধু মাস্টারমশাই।

বিশ্ব ভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫০)

হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তার আগে থেকেই কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। বাংলাদেশে খুলনার সেনহাটি হাইস্কুল ছিল এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান। নানান কারণে শ্যামাপ্রসাদ এই স্কুলটি চালাতে পারছিলেন না। তিনি পুণ্যানন্দজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং এই সমস্ত ছেলেকে পাঠাতে চাইলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজী রাজি হলেন। পরবর্তীকালে ওই ছাত্রদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের টাকা দান করলেন। এই টাকায় তৈরি হয়েছিল 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। ১৯৪৫ সালে শ্যামাপ্রসাদ রহড়ায় এসেছিলেন ছাত্রদের দেখতে। ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন সেনহাটি হাইস্কুলের ছাত্র কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী বা কেষ্ট, যিনি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ বা কেষ্ট মহারাজ, রহড়া বালকাশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তথা বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

কৃষ্ণকমল হিন্দু মহাসভার শাখা কেন্দ্র কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ৮নং শিবনারায়ণ দাস লেনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন পর চলে গেলেন হিন্দুমহাসভার খুলনার সেনহাটি হাইস্কুলে। সভার স্কুল উঠে গেলে ১৯৪৪ সালের গোড়ায় কলকাতার ১০নং নলিনী সরকার স্ট্রিটে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় স্বামী পুণ্যানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন তিনি। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ বারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'তত্ত্বমসি' পত্রিকায় লিখেছিলেন রহড়া বালকাশ্রমের ইতিহাস। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের পর তাঁর মেজদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ধরে হিন্দুমহাসভা পরিচালিত একটি ছাত্রাবাসে তাঁকে ভর্তি করে দেন। জানা যায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততার কারণে আসতে না পারলেও অনাথ ছাত্রদের তিনি খোঁজ খবর নিতেন। অনাথ ছাত্রদের জন্য শ্যামাপ্রসাদের বেদনার্ত হৃদয়, তাঁর সেবাকাজ, আর্তত্রাণের ইতিহাসও বোধহয় হারিয়ে যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে গবেষণা করলে একটি সময় 'সাম্প্রদায়িক পদবাচ্য' হতে হতো। ভয়ে-ভক্তিতে তাই সে পথে বিশেষ কেউ আর যাননি। শিক্ষাবিদ হিসেবে যদি তাঁর টুকরো টুকরো বহু উদাহরণ জুড়ে আঞ্চলিক ইতিহাস উপাদানের পুঁথি গাঁথা হয়, তবে সামগ্রিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদকে সাংসদ হিসেবে দক্ষতার জন্য ডাকা হতো 'ভারত কেশরী'। 'বাপ কা বেটা' বলতেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের ক্ষেত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন, অভাব অভিযোগ জানানোর একমাত্র পাত্র হচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৫ সালে একটি চিঠিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, 'ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে তুমি দেখিতেছি বাপ কা বেটা হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে পারিবে না।' ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে আসীন হলেন শ্যামাপ্রসাদ। পিতা-পুত্র কোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রসরতাকে প্রবল গতিসম্পন্ন করেছেন এমন উদাহরণ সম্ভবত একটিই— উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তার উত্তরাধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে বাবাকে কাছ থেকে অনুসরণ করেছিলেন বলেই শ্যামাপ্রসাদও আর এক সফল উপাচার্য হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অনেকে মনে করেন, আশুতোষের মৃত্যুর পরই 'উপাচার্য' হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আসলে তা নয়, পিতার মৃত্যুর অন্তত দশ বছর বাদে তিনি উপাচার্য হন এবং উপাচার্য হবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নানা কাজ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলান, নিজের যোগ্যত

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

প্রমাণ করেই ওই পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি।

আশুতোষের প্রয়াণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে উৎকর্ষতার প্রবল অভাব অনুভূত হয়েছিল। একাগ্রতায়, অধ্যবসায়ে, সাধনায় ও প্রজ্ঞায় তা পূরণ করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এক্ষেত্রে পারিবারিক ঘরানা খুবই কাজে দিয়েছিল, ছোটোবেলাকার জেদও। পাঠক্রমে ও প্রশাসনে পিতাপুত্র উভয়েই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধন করেছিলেন। আশুতোষের হাতে উপাচার্যের দায়িত্ব ছিল ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। তবে এটা ঠিক, জীবদ্দশায় পিতার শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন পুত্র। সামান্য সময়ের জন্য হলেও পরিচালনার কাজ একসঙ্গে করার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর সদস্য মনোনীত হন তিনি। তার কয়েকমাস বাদে পিতার মৃত্যু ঘটে। তারপর তিনি সিন্ডিকেটেরও সদস্য হলেন। তখন তার বয়স মোটে ২৩। ১৯৩৪ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি উপাচার্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বর্ণযুগ' বলতে যা বোঝায়, তা হলো তাঁর পিতার ১০ বছর এবং পুত্রের চার বছর মেয়াদি উপাচার্য পদে আসীন হবার কালপর্ব। অনেকের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশলী কার্যকর্তা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ নির্ধারিত সময়ের অনেকদিন আগে এবং পরেও কাজ করে গেছেন, তা De facto উপাচার্যর মতোই। ১৯৩৪ থেকে হলেন Dejure উপাচার্য। বিদায়ী উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দিও তার নিয়োগে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

উপাচার্য পদ থেকে সরে যাবার পরও ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষাচিন্তার নির্যাস পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বললেন, 'পরাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত স্তরের মধ্যেই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষে নানা প্রান্তে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার মধ্যে ঐক্যসূত্রটি তুলে আনা দরকার।' যখন ১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিচ্ছেন ততদিনে বুঝতে পেরে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কেবল সময়ের অপেক্ষা, আসছেই। তাই উত্থাপন করলেন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ। এইভাবে বাঙ্গলার শিক্ষাবিদ হিসেবে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নিলেন তিনি। বললেন, জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুষ্ঠু নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। তিনি কতকগুলি দিক চিহ্নিত করলেন যা পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষাবিদদের কাছে পথনির্দেশ হয়ে উঠলো। যেমন, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া, দেশের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যস্ত ও নবায়িত করা, ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের পদ্ধতি।

ড. শ্যামাপ্রসাদকে ত্রিভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা সওয়াল করতে

শ্যামাপ্রসাদ (মধুপুরে)

দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা যা ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষার ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অপরিহার্য। ভাষা সম্পর্কে তিনি গোলমেলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশের ভাষা বলে উপেক্ষাও তিনি করেননি, আবার প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তার মধ্যেকার মণিমাণিক্য সংগ্রহে জোর দিতে বলেছেন, বিশেষত তার মধ্যে অনাবিষ্কৃত উপাদান সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

নারী শিক্ষার প্রতি যত্নবান হতে শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Home Science) পাঠ্যক্রমের সূচনা করেছিলেন তিনি। আরও যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের, তা হলো কলকাতায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা, ফলিত পদার্থবিদ্যায় Communication Engineering পাঠ্যক্রমের আয়োজন, শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন, প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য মিউজিয়াম স্থাপন ইত্যাদি।

শরীরচর্চা যে জাতি গঠনের অন্যতম বিষয়, তা বুঝেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে খেলাধুলার উন্নতিতে তাঁর অনন্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল। ১. ছাত্রদের খেলাধুলা এবং ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করলেন। ২. ঢাকুরিয়া লেকে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব। ৩. তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। ৪. ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা হলো। □

With Best Compliments

From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com